সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

অক্টোবর ২০১৩

তাতা থৈ থৈ

সুকুমার জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এডভোকেট আবদুল হামিদের সঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কে. রহমান খানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কে. রহমান খানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হিন্দি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জনৈক প্রতিযোগীর উপহার গ্রহণ

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ভারত ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ভারতীয় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের সমাবেশে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

৪ অক্টোবর ২০১৩ বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর 'ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া' শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতায় ভারতের রাজ্যসভার সদস্য শ্রী মণিশঙ্কর আইয়ার

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশের মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারতের শিলং চেম্বার কয়্যারের সঙ্গীত পরিবেশন

২৯ আগস্ট ২০১৩ কাজী অনির্বাণ-এর 'এ ডিরেক্টরি অফ বেঙ্গলি সিনেমা' বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চলিস্নশ | সংখ্যা ০৬ | আশ্বিন-কার্তিক ১৪২০ | অক্টোবর ২০১৩

আইআইপিএম

তাতা থৈ থৈ

সূচিপত্র

সত্যাগ্রহ বিষয়ে গান্ধী অনুধ্যান ০৪

মৃত্যুর স্বরূপ ও মৃত্যুচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ১০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'ত্রিবৃত্ত' থেকে বৃত্তায়ন ১৫

ছোটগল্প: ছায়াপথ ১৯

কবিতা ২৪

রঙ যেখানে নিত্যসঙ্গী ২৬

উড়িষ্যার আইআইপিএম ২৮

ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩২

প্রচ্ছদ রচনা: তাতা থৈ থৈ ৩৬

অনুবাদ গল্প: গ্রীষ্মের দিন ৪৪

শেষ পাতা: পি-ত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

সত্যাগ্রহ বিষয়ে গান্ধী অনুধ্যান

১৯০৬ সালকে যথার্থই বলা হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী সোপান। মানবতা ও মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার আত্মিক জাগরণ তাঁর ঘটেছিল এই বছরেই। শপথ নিয়েছিলেন সংকীর্ণ জৈবিক সাংসারিক বন্দিত্বের অবসানের; শপথ নিয়েছিলেন চির কৌমার্যের আর আদরণীয় করে তুলেছিলেন গোটা মানবজাতিকে তাঁর সংসারের বন্ধনে বাঁধবার সংকল্পে। মানবতার বিরুদ্ধে বঞ্চনা প্রশমনের অস্ত্র হিসাবে সত্য ও অহিংসাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভাষ্যে সেই পথের নাম সত্যাগ্রহ।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই

এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী

জুন ২০১৩ সংখ্যা *ভারত বিচিত্রায়* তাপস হোড় মহাশয়ের লেখা সদ্যপ্রয়াত বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিটি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর শতাধিক বর্ষব্যাপী ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনকালের কর্মযজ্ঞের সালতামামি নান্দনিক-ভাবে বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশে তাঁর অনেক গুণগ্রাহীর মধ্যে আমি একটু অন্ধকারেই ছিলাম বৈকি? হোড় মহাশয় স্বল্পপরিসরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর একটি চিত্র আমাদের পরিবেশন করে কৃতার্থ করেছেন, একথা না বললেই নয়।

আমরা যারা ছাত্রজীবনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন অন্যতম। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক কর্মকা- নিয়ে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক– আমার এক কাকা চট্টগ্রাম ডিস্টিলারিতে চাকরি করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কার পেটে ক'টা পীহা আছে গুণে দিতে পারত। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় তাই ছিল আমাদের ভরসা। তবে ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আন্দামান জেলের বহু রাজবন্দীকে মুক্ত করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে গান্ধীজিরও চাপ ছিল। তখন যাঁরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখের নাম মনে পড়ে। *যুগান্তর* কাগজে লোকনাথ বলের একটি সাক্ষাৎকারের কথা আজও মনে পড়ে– চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যে গোপন পরামর্শ হয় সেখানে লোকনাথ বলের ১২ বছর বয়সী ছোটভাই টেগরা (টাইগার) আড়ালে থেকে সব কথা শুনে সেই অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার ভয়ে অনভিজ্ঞ টেগরাকেও সঙ্গে নেওয়া হয়। অভিযান শেষে পালাবার সময় টেগরা গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে বহন করে নেওয়া অসম্ভব হওয়ায় তার মাথাটি কেটে সঙ্গে নেওয়া হয়। কাগজে পড়ার সময় যেমন গা শিউরে উঠছিল, তেমনি অশ্রুধারাও বাধ মানেনি। আমি গ্রামে থাকি। কাজেই কলকাতা গিয়ে তাঁদের সান্নিধ্যলাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারত ও পকিস্তান ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর পাকিস্তানের গভর্নর হন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে সদ্য কারামুক্ত রাজবন্দীরা যার যার ইচ্ছামত দেশ ত্যাগ করেন। বিনোদবিহারী চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নেলী সেনগুপ্তা, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দ চক্রবর্তী, ফণিভূষণ মজুমদার, সতীন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, ইলা মিত্র, লীলা রায় প্রমুখ পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। কিন্তু পাকিস্তান সরকার 'হিন্দু-মুসলিম এক জাতি' ধারণা ফিরে আসার আশংকায় তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। পাকিস্তান সরকার চাইতেন তাঁরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে পাকিস্তানের অধিকসংখ্যক লোকের ভাষা বাংলাকেও গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলে বিনোদবিহারী চৌধুরী, নেলী সেনগুপ্তা, মনোরঞ্জন ধর ও অন্যরা প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর সমর্থনে সোচ্চার হন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে ছাত্রদের আত্মাহুতি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা অসাম্প্রদায়িকতার পথে ধাবিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ এবং প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচিত হয়। ইতোমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাত্র-যুব ফ্রন্টের নেতৃত্বের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান যুব নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আইউব খানের সামরিক শাসন, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন পেরিয়ে

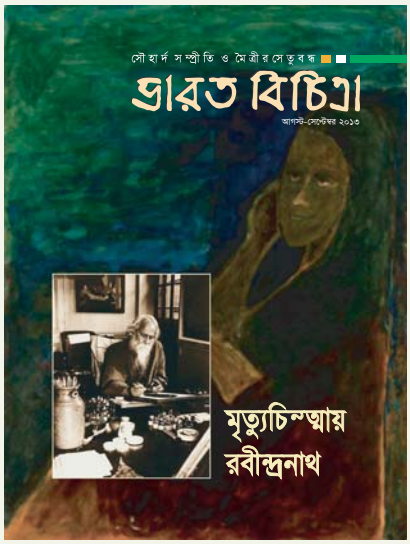

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিনোদবিহারী চৌধুরী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পরে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও বিনোদবিহারী চৌধুরী যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর পরেও তিনি সকলের সঙ্গে মিলে দেশসেবায় ব্রতী হন। বরাবরই তিনি বিপ্লবীর তেজোদীপ্ত ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যান। এভারেই তিনি সকল মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হন। দেশবাসী তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারদার নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠায় তিনি এককালীন টাকা দান করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মাস্টারদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম অনুপ্রেরণাস্থল। স্বাধীনতা সংগ্রামে মাস্টারদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের বীজমন্ত্র। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয় মাস্টারদার নামে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীহলের নাম রাখা হয় বীরকন্যা প্রীতিলতার নামে। মাস্টারদার অনুগামী এই অসমসাহসী নারী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে আত্মঘাতী হন।

বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী নজরুল-রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক বাংলার স্বপ্ন ধারণ ও লালন করেছিলেন আমৃত্যু। তাঁর অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং যাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ চট্টগ্রামবাসীদের তো বটেই, সমগ্র দেশবাসীকে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর মৃত্যুতে জাতি এক আদর্শ সন্তানকে হারাল। তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে চির জাগরুক থাকুক। তাঁর আদর্শ অমর হোক। তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সমীররঞ্জন শীল
'আনন্দ নিকেতন', হাউজ ৭৯, রোড-৪, বক-বি
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

সম্পাদকীয়

শরৎ যেন এক সন্ধিক্ষণ– একই সঙ্গে অনেক ঋতুর আবেশ অঙ্গে ধারণ করে সে যেন এক মূর্তিমতী ঐশ্বর্য। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা– থেকে থেকে পশলা পশলা বৃষ্টি বর্ষাঋতুর কথা মনে করিয়ে দেয়। সকালের রৌদ্রের প্রখরতা মনে গ্রীষ্মের দাবদাহের স্মৃতি বয়ে আনে। ধানের খেতে সারাদিন মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা। রাতের বাতাসে হিম, জলে আকস্মিক শীতের তীক্ষ্ণতা মনে আসন্ন শীতের আবহ বিস্তার করে।

এই শরতে শুভ্র কাশের বনে ভোরের হিমেল হাওয়ায় পাখির আনন্দকলর বে কিসের যেন এক আবাহন শুরু হয়। বহু দূর থেকে ভেসে আসা অশ্রান্তপ্রায় ঢাকের বাদ্যে যেন সেই আনন্দেরই আহ্বান– মা আসছেন। আমাদের আটপৌরে চালাঘরে জগজ্জননী মাকে কোথায় রাখি! কিন্তু দূরের পাহাড় থেকে যে মা স্বামীপুত্র পরিজন পরি বেষ্টিত হয়ে আমাদের গরীব ঘরে নাইওরে আসেন, তিনি যেন সব জানেন। স্মিতহাস্যে আমাদের যাবতীয় অপূর্ণতা তিনি মার্জনা করে দেন। পিতৃপক্ষের পর দেবীপক্ষের সূচনায় অমল ধবল মেঘের দোলায় চেপে এবার তাঁর আগমন। সেই আগমনে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার বারতা। মা আসুন– আমাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষের বিষ মুছে দিন।

নবজাগরণের শৈশবাবস্থা পেরিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যখন রীতিমত সাবালকত্ব অর্জন করেছে, রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গিয়েছেন নোবেল পুরস্কারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তখন এই বাংলার এক যুবক এক অভিনব চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। হাসিঠা ট্টায়, নির্মল কৌতুকে আশ্চর্য খেয়ালরসের জারকে বাঙালিকে নিমজ্জিত করলেন। 'আবোল তাবোল' নামের মাত্র বাহান্ন পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদে বইয়ে এই সুকুমার যুবাপুরুষ বাংলা শিশুসাহিত্যের মেজাজ আমূল বদলে দিলেন। সেই বই যেন লাল গানে নীল সুর বসানো উদ্ভট আজগুবি তাজা রসের ভিয়েন। অকালপ্রয়াত এই রঙিন মানুষটির জন্মদিনে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি– তাতা থৈ থৈ, আশা করি পাঠকমনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

শরতের এই স্নিগ্ধ বাতাবরণে ভারতের আরেক প্রান্তে গুজরাটের পোরবন্দরে আরেক মানবশিশুর জন্ম হয়, যিনি অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে অহিংস রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। 'মহাত্মা' অভিধায় সম্বোধিত ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মদিনে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কী আশ্চর্য সমাপতন! তাঁর ভাব ও মন্ত্রশিষ্য লালবাহাদুর শাস্ত্রীও একই দিনে অর্থাৎ ২ অক্টোবর ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হন। গান্ধীজির মত 'পেন লিভিং এন্ড হাই থিংকিং' ছিল গান্ধীবাদী শাস্ত্রীরও জীবনাদর্শ। এঁরা তো বটেই, শরতের সব স্মরণীয় জাতককে আমাদের আন্তরিক প্রণতি জানাই।

প্রবন্ধ

সত্যাগ্রহ

অহিংসনীতি বিষয়ে গান্ধী অনুধ্যান

সবিতা সিং

১৯০৬ সালকে যথার্থই বলা হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী সোপান। মানবতা ও মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার আত্মিক জাগরণ তাঁর ঘটেছিল এই বছরেই। শপথ নিয়েছিলেন সংকীর্ণ জৈবিক সাংসারিক বন্দিত্বের অবসানের; শপথ নিয়েছিলেন চির কৌমার্যের আর আদরণীয় করে তুলেছিলেন গোটা মানবজাতিকে তাঁর সংসারের বন্ধনে বাঁধবার সংকল্পে। মানবতার বিরুদ্ধে বঞ্চনা প্রশমনের অস্ত্র হিসাবে সত্য ও অহিংসাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভাষ্যে সেই পথের নাম সত্যাগ্রহ।

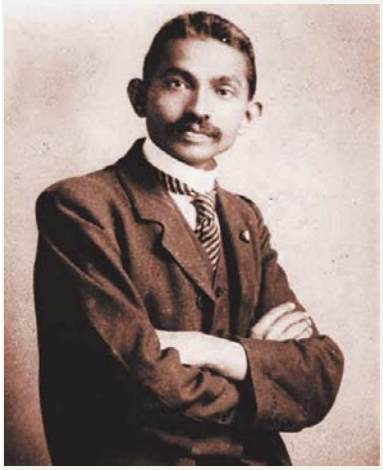

দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যবাদী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকেই এই সত্যাগ্রহের জন্ম ও বিবর্তন। এই কালাকানুন ভারতীয় নারী-পুরুষ, এমনকি আট বছরের বেশি শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। সরকারের কাছ থেকে আঙুলের ছাপযুক্ত শংসাপত্র গ্রহণ করে সব সময় সঙ্গে রাখতে হত। যদি কোন ভারতীয় আঙুলের ছাপ দিতে ভুলে যেতেন বা নথিভুক্ত করতে অসমর্থ হতেন, তাহলে তাঁরা সেখানে বসবাসের অধিকার হারাতেন। এমনকি তাঁদের কারাভোগ করতে হত, জরিমানা দিতে হত। ট্রান্সভ্যাল থেকে তাঁরা বিতাড়িতও হতেন। রাজপথে দাঁড়ানো কোন ব্যক্তির শংসাপত্র নেই, এমন মনে করা হলেই, সেখানে তাঁর নিজস্ব মূল্যবান সম্পত্তি অথবা

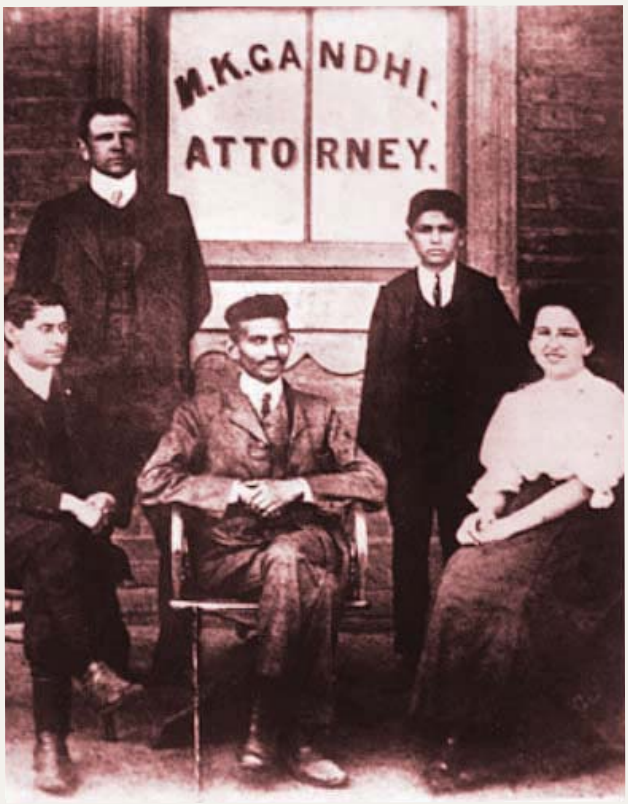

দক্ষিণ আফ্রিকায় এটর্নি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সবাই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ভগবানের নামে শপথ করি এই জন্যই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন– তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য নয়। যদি সেইরকম শপথ নিয়ে আমরা আমাদের অঙ্গীকারকেই অস্বীকার করি, সেক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অন্যায় করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই মানুষটিকে অস্বীকার করি যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনেবুঝে ঈশ্বরের নামে শপথ নেন এবং তাঁকে অস্বীকার করেন... যে মানুষ তাঁর শপথ লঘু করে দেখেন এবং ভেঙে ফেলেন– তিনি নির্দয় এবং এখনই অথবা পরে তিনি অবশ্যই শাস্তি পাবেন।'

গান্ধীজি তাঁদের সতর্ক করে তাঁদের চেতনাকে নাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন সমস্যা মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে, তবে শপথ নেওয়ার এটাই যথার্থ সময়। সতর্কতার একটা ক্ষেত্র আছে তবে তারও পরিসীমা নির্ণয়াতীতভাবে সত্য। সরকার সকল সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়িয়েছে। আমরা সর্বতোভাবে এই প্ররোচনার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে অস্বস্তি এবং কাপুরুষতা আমাদের ঘিরে ধরবে।'

গান্ধীজির এই সিদ্ধান্ত বহির্বিশ্বকে লক্ষ্য করে নয়। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান ব্যক্তিগত শপথসাপেক্ষ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন না কেন, তাঁকে ভেবে দেখতে হবে নিজের অভ্যন্তরীণ সংহত শক্তির কথা। এই প্রতিবাদের ফলে তাঁদের কারাবাস হতে পারে। তাঁরা অপমানিত হতে পারেন; প্রহৃত হতে পারেন; তাঁদের ক্ষুধার্ত থাকতে হতে পারে; তাঁরা প্রবল তাপ কিংবা শৈত্যে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হতে পারেন। তাঁরা কর্মহীন হয়ে যেতে পারেন; নিঃস্ব হতে পারেন; বিতাড়িতও। সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে– বছরের পর বছর। 'কিন্তু সাহস ও নিশ্চয়তার সঙ্গে আমি একথা ঘোষণা করতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তাঁদের শপথমত সংগ্রামে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকবেন, তাঁরা জয়লাভ করবেনই।'

গান্ধীজির বক্তব্যে সমবেত শ্রোতৃম-লী আপুত হলেন। গান্ধীজি গলার স্বর নীচুগ্রামে রেখে বললেন, 'এই প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই আছেন যাঁরা উৎসাহিত হয়ে আজ সন্ধ্যায় শপথ নিয়ে আগামীকাল সকালে অথবা পরের মাসে অনুশোচনায় দগ্ধ হবেন। যদিও অল্প কয়েকজনই এই শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবেন। তাতে অবশ্য সরকারের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না। আমার কাছে একটিই রাস্তা খোলা আছে', গান্ধীজি বললেন, 'মরতে তো হবেই কিন্তু এ ধরনের নিপীড়নমূলক আইনের কাছে নতিস্বীকার করে নয়।'

ভারতীয়রা আবেগে আপুত ও উদ্বেল হয়ে উঠলেন। সভা শুরু করার প্রাকমুহূর্তেও অর্কেস্ট্রা, ব্যালকনি এবং গ্যালারি জনাকীর্ণ ছিল। আগুনঝরা বক্তব্য ভারতীয়দের প্রতিবাদের ভাষাকে চারটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে আবেগের উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছিল। তারপর শেঠ হাজি হাবিব সিদ্ধান্তটি পড়ে শোনালেন। সিদ্ধান্ত রচনার কাজে হাজি সাহেবকে সহায়তা করেছিলেন গান্ধীজি। সিদ্ধান্তে রেজিস্ট্রেশন কানুনটিকে বলবৎ না করার বিষয়টি ছিল। হাজি হাবিব উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করলেন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু প্রথাগত অনুশাসনে নয়। তিনি বললেন, ভোটদানের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে হবে। 'ঈশ্বর আছেন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায়'– তিনি উপস্থিত সকলকে

বোয়ারের যুদ্ধের সময় গান্ধীজির গড়া ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে...

স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কানুনটি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই ছিল। কাজেই শুরু হল এর বিরোধিতা। ভারতেও যদি এই কানুন বলবৎ হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও তা প্রবর্তিত হবে। শেষে কোন ভারতীয়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে পারবেন না। উপরন্তু এই কানুনের আওতায় একজন পুলিশ অফিসার কোন ভারতীয় মহিলার কাছে যে কোন সময়, তা সে রাস্তায় চলার সময় হোক বা গৃহকোণে প্রবেশের সময়, তাঁর কাছ থেকে নথি চাইতে পারবেন। যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাজনিত কারণেও সেই ঘটনাটি ঘটে যায়, তাহলে তার ফলাফল হিন্দু এবং মুসলমানদের কাছে মারাত্মকভাবে ভয়াবহ। প্রাথমিক সমিতির সভায় গান্ধীজির উপস্থিতিতেই আবেগতাড়িত এক ভারতীয় বলেছিলেন, 'যদি কেউ আমার স্ত্রীর কাছে শংসাপত্র চায়– আমি তাকে সেখানেই গুলি করে মারব। তারপর যা হওয়ার তা হবে।' ১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বার্গের এম্পায়ার থিয়েটারে জনগণের মনোভাব এমনটাই ছিল।

সভাপতি তাঁর ভাষণে যথেষ্ট সৌজন্যঋদ্ধ শব্দ যোগ করলেন। তারপর মতামত বা ভোটদানপর্ব শুরু হল। উপস্থিত সবাই যেন জেগে উঠলেন। হাত তুললেন এবং ঈশ্বরের নামে শপথ করে বললেন, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই কালাকানুন প্রবর্তন যদি আইনের স্বীকৃতি পায়– তাঁরা সেটা মানবেন না। তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এ ঘটনার অভিনবত্ব ও অসামান্যতা অনুভব করতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। ঈশ্বর এখানে কার্যক্ষম প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায়। এ এক ধর্মযুদ্ধের শপথ যা কখনও ভাঙা যাবে না। এ কোন সাধারণভাবে 'হাত তোলা' ভোটদান পর্ব নয়, যা সাধারণ অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে এবং অনতিবিলম্বে মানুষ তা ভুলে যায়।

পরের দিন ১২ সেপ্টেম্বর এম্পায়ার থিয়েটার সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। অনেক ভারতীয় ভাবলেন, এ যেন বিধাতার অভিশাপ। কালাকানুনটিরও একই দশা হবে। হয়তো এটি ছিল নেহাতই কাকতালীয় কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৬এ ইতিহাস তৈরি করলেন।

পরের 'জরুরি' কাজটি ছিল জনপ্রতিবাদের একটি সঠিক নামকরণ করা। 'প্যাসিভ রেসিসটেন্স' (পরোক্ষ প্রতিরোধ) সক্রিয় সমর্থকদের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেই আলোচনা সভায় মি. হসকেনের মত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখছেন, 'ট্রান্সভালের ভারতীয়রা পরোক্ষ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন তখনই যখন অন্যান্য অভিযোগের সমাধান হচ্ছিল না। তাঁদের ভোটাধিকারও ছিল না। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তাঁরা অবশ্যই ন্যূন– তাঁরা দুর্বল ও নিরস্ত্র। সুতরাং তাঁরা পরোক্ষ প্রতিরোধের বিষয়টিকেই অস্ত্র করে তুললেন যা একমাত্র দুর্বলের অস্ত্র।'

'এই পর্যবেক্ষণ' গান্ধীজির কথায়, 'আমাকে অবাক করে দিল এবং যে বক্তব্য আমি পেশ করেছিলাম তার সঙ্গে হসকেনের মন্তব্য একটা ভিন্নতর মাত্রা যোগ করল। মি. হসকেনের সঙ্গে বিপ্রতীপ মনোভাবের ক্ষেত্রটিকে আমি সংজ্ঞার্থে নির্ণয় করেছিলাম পরোক্ষ প্রতিরোধের একটি আত্মিক শক্তি হিসাবে। আমি দেখলাম সভায় 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' বাগধারা এক ভয়ঙ্কর রকমের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। আমি এই বিষয়টির পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব। পরোক্ষ প্রতিরোধ এবং আত্মিক শক্তির বিষয়ে যুক্তির ঊর্ধ্বায়ণ ও পরিবর্ধন করেছিলাম, যা আমি ওই সভার পূর্বেই পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, অন্য এক প্রাথমিক আলোচনায়।'

যুবক গান্ধীর কিছু পরোক্ষ বিষয় ছিল না। তিনি এই বিষয়টি বিশদভাবে বিবৃত করেছিলেন তাঁর লেখা 'সত্যাগ্রহ ইন সাউথ আফ্রিকা' নামক পুস্তকে। কেন তিনি এই 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' জাতীয় শব্দনিচয়কে অপছন্দ করতেন, তার ব্যাখ্যা আছে এই পুস্তকে। ১১ সেপ্টেম্বর এম্পায়ার থিয়েটারে সামগ্রিক সংকল্পব্রত গ্রহণ করার পর অহিংসাজনিত প্রতিবাদের সঠিক নামকরণের বিষয়ে একটি পরামর্শপ্রদান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সঠিক নামদাতার জন্য তিনি একটি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন। সরকারি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামকরণ হবে ব্যক্তি ও জনতার মনোভাবের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে।

ফিনিক্স ফার্মের বাসিন্দা মহাত্মাজির মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র মগনলাল গান্ধী নামকরণ করেছিলেন 'সদাগ্রহ', যার অর্থ ছিল শুভ কারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া। মহাত্মা সেই নামটি পরিমার্জিত করলেন 'সত্যাগ্রহ'

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে...

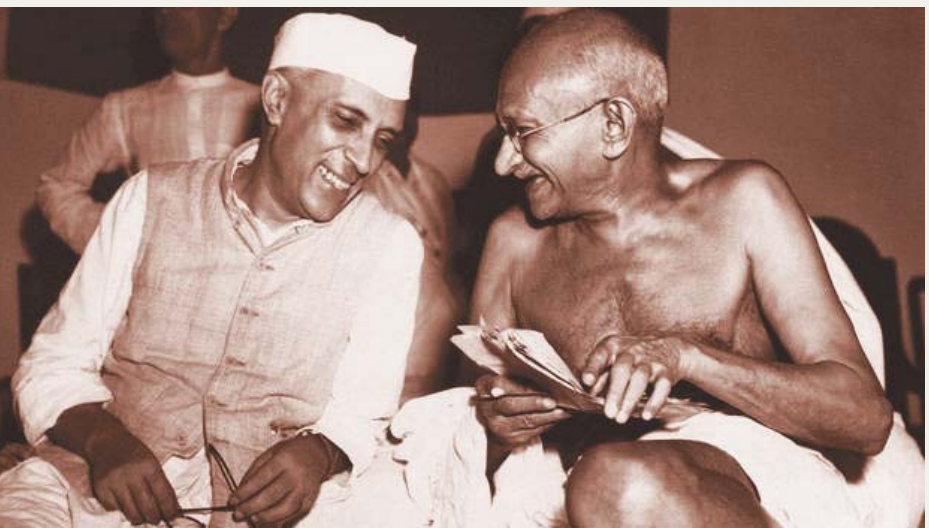

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সঙ্গে...

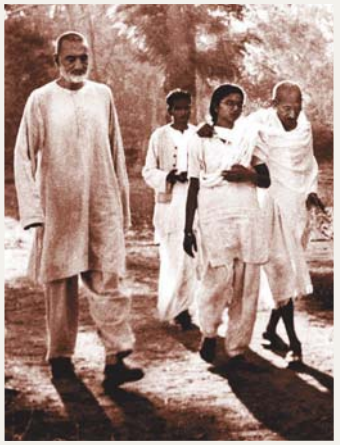

দুই নেতা– সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে...

গান্ধীভাষ্যে সত্যাগ্রহ হল সত্যের জয়– বিরোধীদের পীড়নের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে। আত্মসংযম তাই এর একমাত্র প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। দেশের সার্বিক শক্তির বিকাশ এই পথেই– গান্ধীজির দূরদর্শিতা সেই পথেই। কালাকানুনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে তাঁকে কারাদ- দেওয়া হল। তিনিই প্রথম সত্যাগ্রহী যিনি মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেছিলেন।

নামে। সত্য যা তাই মঙ্গলময়; ভালবাসা এবং 'আগ্রহ' হল শক্তি। 'ভালবাসা আমার সফল প্রকাশনির্যাস। সুতরাং সত্যাগ্রহ হল আত্মার শক্তি– আত্মশক্তি।' প্রবীণ গান্ধীবাদী ড. আর আর দিবাকর বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, 'সত্যাগ্রহ হল জীবনের নবসরণী, নৈতিক শক্তিই অহিংস আন্দোলনের আকার। নৈতিক উদ্দেশ্যই জয় করবার উপাদান যোগায়।'

গান্ধীভাষ্যে সত্যাগ্রহ হল সত্যের জয়– বিরোধীদের পীড়নের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে। আত্মসংযম তাই এর একমাত্র প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। দেশের সার্বিক শক্তির বিকাশ এই পথেই– গান্ধীজির দূরদর্শিতা সেই পথেই। কালাকানুনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে তাঁকে কারাদ- দেওয়া হল। তিনিই প্রথম সত্যাগ্রহী যিনি মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। এটি এক বিশেষ তাৎপর্যবাহী পরীক্ষা যা সমগ্র বিশ্বে আশার সঞ্চার করেছিল। প্রমাণ হয়েছিল যে, যোদ্ধার প্রকৃতি পীড়নের ভূমিকায় ক্ষমতা প্রদর্শন নয়, ঐশ্বরিক দীপ্তিই তার প্রদর্শন। ঘটনাক্রমে সত্যাগ্রহ হয়ে উঠল তাঁর জীবন দর্শন। জীবৎকালে এইই হ য়ে উঠেছিল তাঁর ধর্ম। মৃত্যুও তাঁর এই কারণেই।

তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষক হিসাবে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জনজাতির মধ্যেও এক ক্রমিক রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই নতুন পদ্ধতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যদিও তারা ছিল সংখ্যালঘু। পরিতৃপ্তির মাত্রার সীমারেখার কথাও গান্ধীজি লেখেন। 'আন্দোলন যত তীব্রতর হয়েছে, ইংরেজরা সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছে। যদিও ট্রান্সভালের ইংরাজি সংবাদপত্র ইউরোপীয়দের কালাকানুনকে সমর্থন করেই তাদের মতামত প্রকাশ করেছে, তবুও তাঁরা পরিচিত ভারতীয়দের লেখা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা সরকারের প্রতি ভারতীয়দের প্রতিবেদন সম্পূর্ণভাবে, কখনওবা আংশিকভা বে তার সারাৎসার সংবাদপত্রে প্রকাশ করতেন। কখনওবা প ত্রিকা সংস্থা সাংবাদিকদের পাঠিয়ে দিতেন ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ সভায়। যখন তা আর হত না, আমরা এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম।'

সত্যাগ্রহের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও সূচনায় আমরা গান্ধীজির সাংগঠনিক দক্ষতার গুণপনা লক্ষ্য করি যখন তিনি চারশো ভারতীয়কে নিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যামবুলেন্স কোর গঠন করেন বোয়ারের যুদ্ধের সময়, সেখানে তিনি নিজেই সার্জেন্ট মেজর। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি কোরকে আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছিলেন; ভারতীয়দের কাছে নিজের সক্রিয়তা নিবেদিত রেখেছিলেন। জুলু উপজাতি যুদ্ধের পটভূমিকায় ১৯০৬ সালে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে ২৪টি স্ট্রেচারবাহক সমিতি গঠন করেন।

১৯১৩ সালের ২৮ অক্টোবর গান্ধীজি নিউক্যাসেল থেকে ভোলকসরাস্ট পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষকে নিয়ে ঐতিহাসিক পদযাত্রার নেতৃত্ব দিলেন, এটি যেন ছিল ডান্ডি অভিযান মহাকাব্যের পূর্বাভাস। এই প্রতিবাদ ছিল তিন পাউন্ড শুল্কের বিরুদ্ধে, যা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দিতে হত। ঘটনাক্রমে জেনারেল স্মাউটস সত্যাগ্রহীদের প্রতিবাদে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন এবং ১৯১৪ সালের ২১ জানুয়ারি গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হলে সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হয়।

দুই মনীষী– রবীন্দ্রনাথ ও ফরাসি দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে...

১৯৩৩ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে...

দক্ষিণ আফ্রিকায় সামাজিক সাম্যের লক্ষ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধীজি এক মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফিকায় পা রাখা থেকে ১৯১৪ সাল অবধি গান্ধীজি অসাম্য ও বৈষম্যের সুষ্ঠু বিচারের লক্ষ্যে স্বদেশবাসীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কাজ করে গেছেন। এমনকি এই বৈষম্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও ছিল, যখন ভারতীয়রা নাটালে পৌঁছেছিলেন। সত্যাগ্রহের মত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গান্ধীজি অচিরেই ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কাছে এক অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি বিভিন্ন চিন্তানায়কের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল তাঁর প্রাথমিক পাঠ– 'এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ'। এখানে তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দর্শন প্রাণ পেয়েছিল। জন রাসকিনের 'আন টু দিস লাস্ট', লিও টলস্টয়ের 'দ্য কিংডম অফ গড ইজ উইদিন য়্যু', হেনরি ডেভিড থুরোর 'সোস্যাল নন-কোপারেশন মুভমেন্ট' প্রভৃতি রচনাও তাঁর মননশীলতায় গভীর ছাপ ফেলেছিল। এসবেরই আলোকময় প্রেরণা তাঁর 'সর্বোদয় দর্শন'।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এর বৈপব্বিক অবদান সমসাময়িক আর্থরাজ নৈতিক চিন্তাধারায় অভাবনীয়। এ দু'টি চিন্তাধারা একেঅপ রের পরিপূরক। এর উপাদানগত ধারণা সত্য ও অহিংসা– সত্য এবং অসূয়ানিরোধ, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্য। গান্ধীজির মৌলিকত্ব হচ্ছে তত্ত্ব ও ব্যবহারে যোগস্থাপন। তাঁর সত্যাগ্রহ তত্ত্ব বা অহিংস প্রতিরোধ এবং সর্বোদয় অথবা বিশ্বজনীন মঙ্গল স্বাভাবিকভাবেই যুক্তিঋদ্ধ উপপাদ্য হয়ে ওঠে তাঁর মানবপ্রকৃতির মৌলিক বিচারে এবং তা এক পরিপক্ক ফলের মত বারবার পরীক্ষিত হয়েছে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে।

সবিতা সিং
গান্ধী স্মৃতি ও দর্শন সমিতির অধীড়াক

সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ**

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি বিভিন্ন চিন্তানায়কের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল তাঁর প্রাথমিক পাঠ– 'এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ'। এখানে তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দর্শন প্রাণ পেয়েছিল। জন রাসকিনের 'আন টু দিস লাস্ট', লিও টলস্টয়ের 'দ্য কিংডম অফ গড ইজ উইদিন য়্যু', হেনরি ডেভিড থুরোর 'সোস্যাল নন-কোপারেশন মুভমেন্ট' প্রভৃতি রচনাও তাঁর মননশীলতায় গভীর ছাপ ফেলেছিল। এসবেরই আলোকময় প্রেরণা তাঁর 'সর্বোদয় দর্শন'।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী ও ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে...

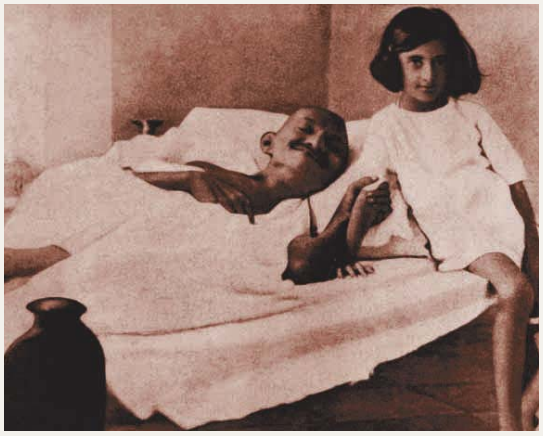

প্রবন্ধ

মৃত্যুর স্বরূপ ও মৃত্যুচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ

খালেদ মতিন

পূর্ব প্রকাশিত-র পর

জীবন মাত্রই সুখ-দুঃখ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ কুটসমস্যার বেড়াজাল। নিরঙ্কুশ সুখসম্ভোগ তো অলীক কল্পনা। কি দরিদ্র, অসহায়, পথ-কাঙাল, কি আকাশচুম্বী প্রাসাদের স্বত্বভোগী– কারো সমস্যার অন্ত নেই কিন্তু মৃত্যু যখন আসে, মুহূর্তে সকল সমাধানের সূত্র রচিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রজ্বালা, ধনপতির ধনজ্বালা, ধনীর ভয় ও উৎকণ্ঠা, রোগীর রোগযন্ত্রণা, প্রেমিক বা প্রেমিকার বিরহ-বিচ্ছেদকাতরতার সমাধান মুহূর্তে। শান্তি শান্তি ওম্ শান্তি– যতই শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হোক– মৃত্যুই মানবজীবনের শান্তিসুখের শ্রেষ্ঠতম পন্থা। কবিতার শুরুতেই কবি মৃতের অস্তিত্বে সেই মহাশক্তির আভাস দেখেছেন–

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে
... ...
যতকিছু ভালমন্দ যতকিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই
বলো শান্তি বলো শান্তি দেহসাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।

এ মরদেহের সঙ্গে সঙ্গে, এ মরজগতের সব সমস্যার সমাধান। জীবন-স্বপ্নের কোন রেশই আর বাকি থাকে না। জগৎজনের সঙ্গেও তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের সমালোচনা অথবা বসন্তকুসুমরাজিতে প্রদত্ত উপহার, কিছুই তার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। তাই তাকে নিয়ে জীবিতজনের সমস্ত আলাপ-আলাপনের

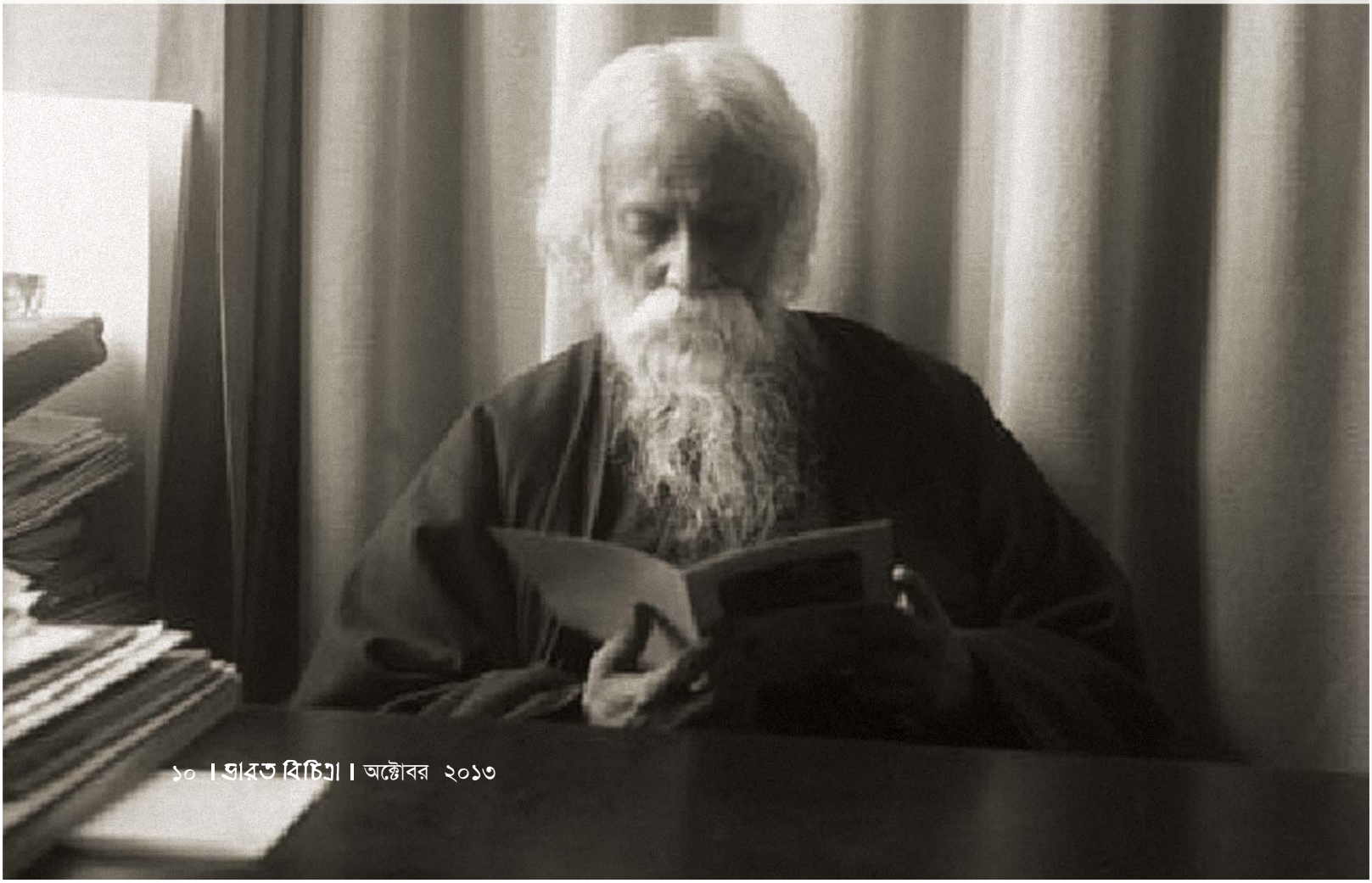

জ্যোৎস্নার অপর পিঠ অমাবস্যার মত, মৃত্যুকে নেতিবাচক বিবেচনায় রেখে, জীবনকামিতার আগ্রহে মৃত্যুর বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের দৃষ্টিটি যেসব কবিতায় বিশেষ উপজীব্য, চিত্রার ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটি তার মধ্যে অন্যতম। মরিতে চাহি না... কথাটিই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে ‘১৪০০ সালে’। মৃত্যুর প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যেহেতু সম্ভব নয়, তাই নশ্বর দেহের বিলুপ্তি সত্ত্বেও, জাগতিক কর্মোদ্যমে কীর্তির মাহাত্ম্যে জীবিত মানবাত্মায় স্থান করে নিয়ে অমরতা, ন্যূনত দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষাই ‘১৪০০ সাল’ কবিতা। বংশ পরম্পরায় মানুষ তার নামের মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় কিন্তু এ তো জৈবিক প্রাণীসত্তার অথর্ব প্রয়াস। প্রতিভাবান মহামানবেরা এভাবে চিন্তা করেন না।

মুখে ছেদ টেনে দেন–
আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন
এত আলাপন!

এখানে আপাত কলকোলাহলপ্রবণ সমাজসংসা রের একটি নির্মম সত্যকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মৃত্যুতেই যদি সব শেষ তাহলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কাটাকাটি, মারামারি, হানাহানি, বিচারবিরোধ কেন? এই মুহূর্তে, ভয়াবহ সন্ত্রাসকবলিত এই সমাজে কবির এই অপ্রিয় সত্যকথনটি বিশেষ গুরুত্ববহ হতে পারে। তবে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। মাৎস্যন্যায়ের দেশে মৃত কি জীবিত, কে কার উপর কখন চড়ে বসে, কে জানে?

সমাজের যার যা ইচ্ছে তা বলুক, যেমন ইচ্ছে আচরণ করুক, কবি সত্যকথনে বিরত হবেন না। মানবের সহস্র জীবনজিজ্ঞাসার রহস্যরূপ তার কাব্যে উদ্ঘাটিত হবেই। জীবনমৃত্যুর জটিল আবর্তে তাই কবির প্রশ্ন, এ তো ক্ষণিকের পান্থশালা। তারপর এখান থেকে সে কোথায় যায়? কোথায় তার ঘর, কোথায় স্থায়ী ঠিকানা?–

হায়রে নির্বোধ নর কোথা তোর আছে ঘর
কোথা তোর স্থান!

হ্যাঁ, সে ঠিকানা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ, তেমনি জীবনও সহস্র আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ, বহু অসম্পূর্ণ, বিস্বস্থ অবস্থার ছড়াছড়ি। আর বিস্রস্ত, অসম্পূর্ণ জীবনকে একমাত্র মৃত্যুই কি পারে সুসম্পূর্ণ অর্থময়তা দান করতে?

জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।

তৎসঙ্গে মৃত্যুর পর এক নতুন জগতের সম্ভাবনার প্রশ্নটিও কবি বাতিল করে দেননি। হয়তো সেই জগতেই সকল সমস্যার সমাধান। সকল অর্থহীনতার অর্থময়তা। সকল অসম্পূর্ণতার মরুদহন, সম্পূর্ণতার পুষ্পাসার সুরভিত সমারোহে ভরে উঠবে। তাই বলে ছাত্রের পিঠে বেত্রাঘাত করে, নিশ্চিত পথের দিশা তিনি দেখাচ্ছেন না–

চিরকাল এইসব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর–
জন্মান্তের নবপ্রাতে সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

জ্যোৎস্নার অপর পিঠ অমাবস্যার মত, মৃত্যুকে নেতিবাচক বিবেচনায় রেখে, জীবনকামিতার আগ্রহে মৃত্যুর বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের দৃষ্টিটি যেসব কবিতায় বিশেষ উপজীব্য, *চিত্রার* ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটি তার মধ্যে অন্যতম। মরিতে চাহি না... কথাটিই প্রকারান্তরে ব্যক্ত হয়েছে ‘১৪০০ সালে’। মৃত্যুর প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যেহেতু সম্ভব নয়, তাই নশ্বর দেহের বিলুপ্তি সত্ত্বেও, জাগতিক কর্মোদ্যমে কীর্তির মাহাত্ম্যে জীবিত মানবাত্মায় স্থান করে নিয়ে অমরতা, ন্যূনত দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষাই ‘১৪০০ সাল’ কবিতা। বংশ পরম্পরায় মানুষ তার নামের মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় কিন্তু এ তো জৈবিক প্রাণীসত্তার অথর্ব প্রয়াস। প্রতিভাবান মহামানবেরা এভাবে চিন্তা করেন না। তাঁরা তাঁদের প্রতিভার কর্মফসল উৎপাদন করে রেখে যান সোনার ধান। তাই উপভোগ করতে গিয়ে, মানুষ যুগযুগব্যাপী তাঁকে স্মরণ করে। ‘১৪০০ সাল’ কবিতায় একশো বছরের পরের কবির কাছে তাই কবির আকুল আবেদন–

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে!
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তার করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে–

‘সিন্ধুপারে’ এই কাব্যের একটি নিগূঢ় রহস্যাচ্ছাদিত কবিতা। বাহ্যত তা প্রায় রূপকথার মত একটি অলীক আখ্যান। পৌষপ্রখর রাতে নিদ্রিত কবিকে মুসলমান নারীদের মতই আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিতা এক অশ্বারোহিণী এসে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর অপর একটি অশ্বারোহণে কবি তার সঙ্গে চলেন। কিন্তু কোথায়? কোন অনিশ্চিত পুরে, অজানায়?–

বিদুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া– বারেক চাহিনু পিছে
ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান মনে হল সব মিছে।
... ...
অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই–
অপরূপ এক স্বপ্নসমান, অর্থ কিছুই নাই।

অতঃপর সেই রহস্যজগতের কোন এক স্থানে, এক ‘সিন্ধুপুলিনে’ অশ্ব এসে থামে। অশ্ব থেকে নেমে ‘আঁধারব্যাদান গুহার মাঝারে...’ কবি সেই সুন্দরীর পশ্চাদ্গামী হন। সেখানে এক রাজপুরী। অপরূপ পাখি, অপরূপ নারী লতাপাতার সৌন্দর্যরুচিশীলতায়, মণিময় পালঙ্কে সেই অবগুণ্ঠিতার পাশে, তারই ইঙ্গিতে, কবি দুরুদুরু বুকে সমাসীন হন। সেই নারীর সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রাচারে, সহস্র নারীর মাথায় বাহিত মঙ্গল উপাচারে পরিণয় সম্পাদিত হয়। সর্বশেষ দৃশ্যে, সবাই চলে গেলে, নীরব বাসরে, কবিরই আবেদনে অবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন যখন উন্মোচিত হয়, তখন চকিত নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে কবি চরণতলে লুটিয়ে পড়েন।–

‘এখানেও তুমি জীবন দেবতা’, কহিনু নয়নজলে
সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি–
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।

কবিতাটির সমাপ্তি রহস্যময়ী অবগুণ্ঠিতার সঙ্গে কবির পরিণয় বা মিলনের মাধ্যমে। মিলনপূর্ব সহস্র অজানা পথপ্রান্তর পেরিয়ে দীর্ঘ অভিসার। অভিসার-শেষে সিন্ধুপারের আঁধারব্যাদান গুহায় রহস্যপুরী। এর সঙ্গে বস্তুজগতের কোন সাদৃশ্য নেই। তাহলে এই কি সেই

পরপারের মৃত্যু নামক রহস্যজগৎ? আর এই জীবনদেবতা কি মৃত্যুর নিকটস স্পর্কিত ঈশ্বর? কবির ব্যাখ্যায় কাব্যলক্ষ্মী? অন্তর্জাত সৌন্দর্যচেতনা যা তাকে নিরন্তর কাব্যজাল বুননে অনুপ্রাণিত করে? এর যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, এতে মৃত্যুচিন্তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। *চিত্রা* কাব্যের 'জীবনদেবতা' কবিতাটিতে কবির আত্মনিবেদিত চেতনা যেভাবে বিধৃত, তাতেও ঈশ্বরচিন্তার রূপ দুর্লক্ষ্য নয়–

পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি।

তিনি মৃত্যুকে কখনো ভীতিকররূপে বর্ণনা করেননি। তাই দেশপ্রান্তর পেরিয়ে, রহস্যলোকে জীবনদেবতা তথা ঈশ্বরচেতনার যে রূপ তা প্রেমের আধারে মৃত্যুলোকের কল্পনা। *নৈবেদ্য* কাব্যে মৃত্যুর এই প্রেমময় রূপকেই আরো সুস্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত করেছেন 'মৃত্যু' সনেটটিতে। শিশুকে মার স্তন থেকে স্তনান্তরে নিয়ে যাবার সময়, শিশুর ভীতসংশয়িত কান্নার সঙ্গে, জীবন থেকে মৃত্যুর মাঝখানের ভীতিটুকুর তুলনা করেছেন কবি। শেষ দু'টি চরণ–

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

নৈবেদ্যে সকল রহস্যর গোলকধাঁধা পেরিয়ে তাঁর সরাসরি বক্তব্য–

জীবনেরে
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুকে এমনি ভাল বাসিব নিশ্চয়।

উৎসর্গ কাব্যের 'মরণমিলন' কবিতার দু'টি চরণ প্রসঙ্গত উলেখ্য–

অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে
মোর মরণ
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও ওগো একি
প্রণয়েরই ধরন!

জন্মান্তর মৃত্যুরহস্যের আরেক রূপ। যদিও তা শাস্ত্রীয় চিন্তার আধারে গ্রথিত, তবু মানতেই হবে, এর সঙ্গে কবি কল্পনার রোমান্সধর্মী চেতনার সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিশেষত রোমান্টিক শিল্পযোজনায় এ চিন্তার প্রভাব অধিক। কবি তার মানসপ্রিয়াকে জন্ম-জন্মান্তরের সাথীরূপে কল্পনা করতে ভালবাসেন। এক জীবনেই যদি তার সঙ্গে লীলা শেষ হয়ে যায়, তাহলে তেমন আর কি? কিন্তু তা কখনো হবার নয়। মৃত্যু প্রেমের পথে কোন বাধাই নয়। মৃত্যু নামক বিচ্ছেদের ধাঁধা প্রেমের আপাতগ্রাহ্য রূপ। তাই প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে কবি জন্মজন্মান্তর চষে বেড়ান। *মহুয়ার* অনেক কবিতায় বিগত প্রেমিকাদের স্মৃতিতর্পণে কার্যত মানসলোকে তাদের পুনর্জন্ম দান করেছেন। তার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের খেলা–

দেবতার বর
কত জন্ম, জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশপাতে
এ দেখার আশ্বাস অক্ষর!

একান্ত প্রথম জীবনেই, কালিদাসপ্রভাবিত রবীন্দ্রমানসে পূর্বজন্মের কল্পলোকবিহারে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের প্রেমিকার রসমূর্তিটি দেদীপ্যমান হয়েছে। কবির নিপুণ ভাষার তুলিতে তার ক্ল্যাসিক্যাল রূপনির্মাণ–

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে...

মৃত্যুর কোন বয়সকাল নেই। এখন পর্যন্ত তাই সত্য। তারপরও যৌবনের টগবগে মুহূর্তে এ কঠিনতম সত্যটিও মানবমনে তেমন অধিকার বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু বার্ধক্য শুধু দেহ নয়, মনের দুয়ারেও হানা দেয়। মৃত্যুর কঠিন সত্য করুণরূপে মনোজগতে বাসা বাঁধে। যিনি যত প্রতাপান্বিত, জ্ঞানী, শিল্পী, কবি বা বুদ্ধিভিত্তিক মেধার অধিকারীই হোন, মৃত্যুর প্রতি নিতান্ত উদাসীন অবহেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথেও, শেষপর্যায়ে, কিছু কবিতায় মৃত্যুর জটিল বর্ণাঢ্য লীলা, সরল দর্শনের ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে। বিয়োগাত্মক দুঃখপরতার এই রূপটি, ১৩৪১৪৪ ব ঙ্গাব্দে রচিত *প্রান্তিক* কাব্যে, তাঁর প্রথম বিধুরচিত্তের সরল সত্য অনুভব–

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে, স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণপুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে।

আম্রমুকুলের গন্ধবহ দখিনা বাতাসে, অশোকমঞ্জরীতে, বাত্যাহত রুদ্রবৈশাখের

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

ভারত বিচিত্রার পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India- ABSSI)র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রার* এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআরবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআইএর কর্মকা- এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমড়ো প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রার* ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

ধূলিধূলাকার ঝঞ্ঝাঘাতে, বসুন্ধরার বুকে বহুকালব্যাপী আতিথ্যলাভের পর তিনি এখন ধন্য।... 'সব নিয়ে ধন্য আমি প্রাণের সম্মানে।' আজ তাঁর জীবনে মুক্তিমন্ত্র ধ্বনি। সে মুক্তি কার্যত মহামুক্তি। কবি আজ সুদূর পথের পথিক। সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূর মতই এই যাত্রা। পশ্চাতের বিধুর ব্যক্তচিত্তে চিরপথিকের বংশীধ্বনি। তিনি তারই অনুগামী–

...চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব
অনুগামী।

অবসন্ন চেতনার গোধূলীবেলায় কোন্ অজানার কাছে আত্মনিবেদিত প্রাণের করুণ মিনতি! সে মিনতির ভাষা সাধক প্রেমিকের মতই। নক্ষত্রবেদির তলে একা স্তব্ধ করজোড়ে তাঁর প্রার্থনা–

নক্ষত্রবেদির তলে আসি
ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড়হাত–
... ...
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে
এক।

এই পর্যায়ে, 'পথের শেষে' এবং 'জন্মদিন' কবিতা দু'টি উলেখযোগ্য। 'পথের শেষে' জীবনপথের সমাপ্তির রূপ অঙ্কন করেছেন কবি। তবে বিদায়মুহূর্তে তাদেরই গুণকীর্তনে মুখর তাঁর কাব্য, যারা মানবজীবনকে আলোকিত ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করেছে–

মন বলে, আমি চলিলাম
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাদের উদ্দেশে যারা জীবনের আলো
ফেলেছে পথে যাহা বারে বারে সংশয়
ঘুচালো–

'ঐকতান' কবিতায় সারাজীবনব্যাপী কাব্যসাধনায় তাঁর অপূর্ণতার দৈন্য অকপটে স্বীকার করেছেন কবি। তবে বিপুল এই পৃথিবীর কতটুকুইবা জানা যায়? তাঁর অপূর্ণতা মোচন ও পূর্ণতা সাধনের ভার পরবর্তী প্রজন্মের হাতেই থেকে যাবে। তাই কাছে যারা, দূরে যারা, সবার কর্মপরতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত কবির নমস্কার–

তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন খ্যাতি–
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার–

'ঐকতান' কবিজীবনের কর্মসাধনার হিসাব এবং এ সম্পর্কিত জবাবদিহিতা। কবিতাটিতে রয়েছে আসন্ন মৃত্যুর করুণ ছায়াপাত।

কালিম্পঙে ১৩৪৫এর ২৫ শে বৈশাখ কবির জন্মদিনে রচিত 'জন্মদিন' কবিতায় সে হিসেব আরো গাণিতিক, তৎসঙ্গে শিল্পচাতুর্যের রসোপাদান সিঞ্চিত। সেই কবিতায় জন্ম-মৃত্যুর একাকার রূপ– জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের একাসনে অধিষ্ঠান।

...জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব
টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে–

পৃথিবীর কাছে কবির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাঁর উদারচিত্ত আজ কৃপণ। মমতাময় বাহুবন্ধন শিথিল। তবু কবির দৃঢ় প্রত্যয়, ধরিত্রী তাঁকে অবহেলিত অসম্মানে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে পারবে না। তাঁকে যেতে হবে বটে। তবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা শেষ মুহূর্তের সম্মানজনক বিদায়–

জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা
জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার
সন্ধ্যারতি

সেই জ্যোতির্ময় সন্ধ্যারতিতেই কবির বিদায়ের গৌরবগরিমা উত্থাপিত হবে।

কবিতা ছাড়াও গল্পে এবং অনেক গানে কবির মৃত্যুচিন্তার বিচিত্র রূপ প্রকটিত। গল্পে *ছুটি, জীবন ও মৃত্যু* ইত্যাদির নাম উলেখ করা যায়। গান তো কবিতারই অঙ্গীভূত। তবু গানের আলোচনায় না গিয়ে উলেখযোগ্য বা অত্যন্ত জনপ্রিয় দু'একটি গানের কলিমাত্র উদ্ধৃত করা যায়–

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ...

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে
চুকিয়ে দেব বেচাকেনা, মিটিয়ে দেব লেনাদেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে

এইসব গানের চিরন্তন আবেদন, চিরবিদায়ের পালাটিকে অশ্রুর অশেষ উৎসধারায় প্রবাহিত করেছে। তবে মৃত্যু-সম্পর্কিত সকল প্রকার দুঃখযন্ত্রণা, ভয়ভীতি ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর কবিতা। এই পরিক্রমায় রবীন্দ্রচেতনায় মৃত্যুর স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাঠকমনের কৌতূহল কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ● সমাপ্ত

খালেদ মতিন
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ অক্টোবর

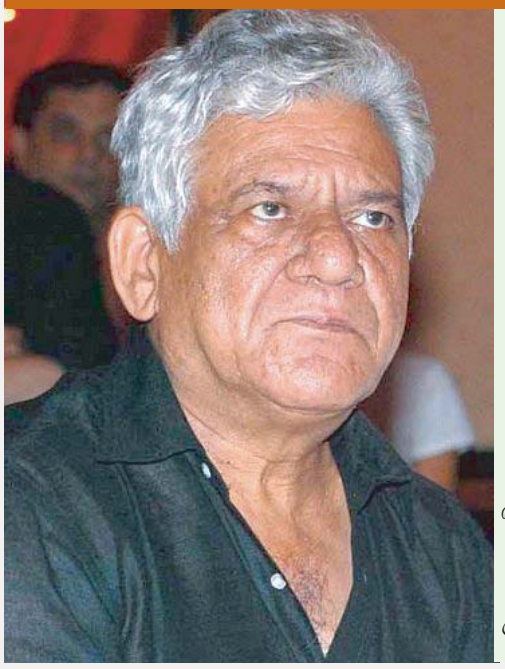

অভিনেতা ওম পুরী

০১ অক্টোবর ১৯০৬ ❖ শচীন দেববর্মণের জন্ম
০২ অক্টোবর ১৮৬৯ ❖ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
০২ অক্টোবর ১৯০৪ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম
০৫ অক্টোবর ১৮৬৮ ❖ অসমীয় লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম
০৬ অক্টোবর ১৯৪৬ ❖ বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্ম
১০ অক্টোবর ১৯১৬ ❖ সমর সেনের জন্ম
১১ অক্টোবর ১৯৪২ ❖ অমিতাভ বচ্চনের জন্ম
১৩ অক্টোবর ১৯১১ ❖ অভিনেতা অশোককুমারের জন্ম
১৪ অক্টোবর ১৯৩০ ❖ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম
১৪ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১৫ অক্টোবর ১৯৩১ ❖ বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্ম
১৮ অক্টোবর ১৯৫০ ❖ অভিনেতা ওম পুরীর জন্ম
১৯ অক্টোবর ১৯২৪ ❖ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম
২২ অক্টোবর ১৯৫৪ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু
২৩ অক্টোবর ২০১২ ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু
৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ ❖ সুকুমার রায়ের জন্ম
৩১ অক্টোবর ১৯৭৫ ❖ শচীন দেববর্মণের মৃত্যু

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

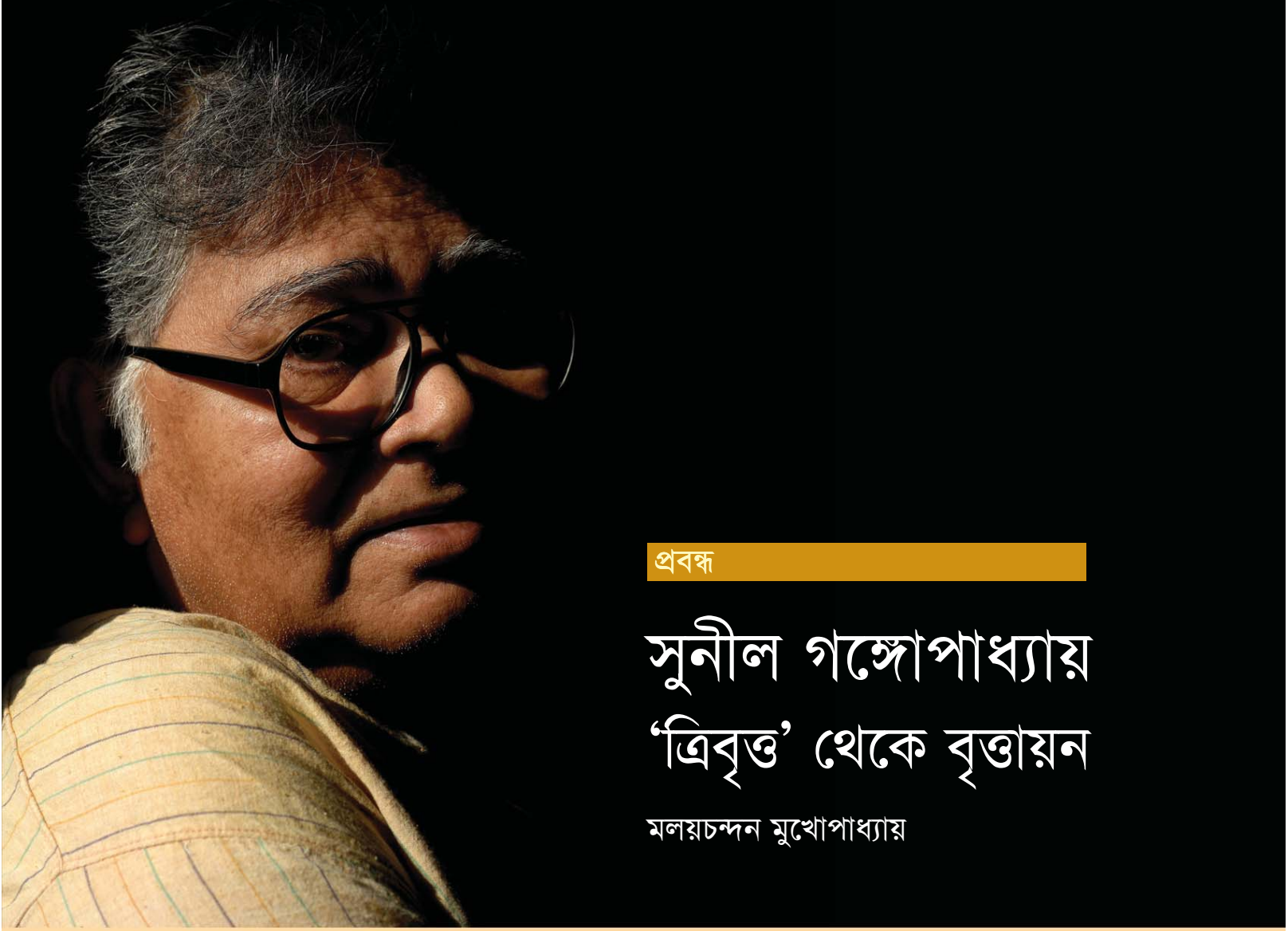

প্রবন্ধ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘ত্রিবৃত্ত’ থেকে বৃত্তায়ন

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্র নাসির আলী মামুন

কবি শিল্পী বিজ্ঞানী দার্শনিক– সকলেরই থাকে উত্তরণ, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে প্রগত হবার। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণই নেওয়া যাক। কৈশোরের রবীন্দ্রনাথ কবিতাঙ্গনে যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করছেন, ‘পদ্যপ্রলাপ’ লিখছেন এভাবে, ‘আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনা/ বলি কী আর বলি’, তার সঙ্গে তাঁর শেষ বয়সের কবিতা ‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’-র কী যোজন যোজন তফাৎ! ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ আর ভাগিনেয়ী ইরাবতীকে নিয়ে যে শৈশব-কৈশোর রবির ‘মনে আছে এক-একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত।’ সেখান থেকে ক্রম-প্রসারণের পথ বেয়ে বেয়ে সত্যপ্রসাদ-ইরার হাত ছাড়িয়ে তিনি আইনস্টাইন-হেলেন কেলার-গান্ধীর হাত ধরেন। প্রতিতুলনায় যাচ্ছি না, তবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনও তো ক্রম-উত্তরণেরই রোজনামচা। তাঁর আত্মজীবনী *অর্ধেক জীবন*-এ তিনি শৈশবের কথা লিখতে গিয়ে জানাচ্ছন, ‘গ্রামের আদিগন্ত পাটখেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে।’

ছোটবেলায় গ্রামের মিষ্টি পুকুরের জল খেয়ে বড় হওয়া সুনীল পরবর্তীজীবনে যে তৃষ্ণা সার্থক করে গেলেন পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশের জলপানে, যথার্থ উত্তরণ বলব একেই। *কৃত্তিবাস* দিয়ে শুরু (তাই-বা বলি কী করে? প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতই সুনীল *কৃত্তিবাস* বার করার আগে আরো একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, *আগামী সাহিত্য* নামে), তারপর দীর্ঘ, সুদীর্ঘ পদযাত্রা, কত দেশের কত ভাষার পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ, লেখালেখি। কত বিচিত্র-স্বভাব মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্য, মতবিনিময়, প্রণয়, বিরোধ ও সমবায়।

কৃত্তিবাস তরুণ কবিদের পত্রিকা। তাই বলে প্রবীণেরা পরিত্যাজ্য নন এখানে, তবে তাঁরা প্রবন্ধে আহূত হবেন কেবল। সমর সেন আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রদের গদ্য পাই তাই কৃত্তিবাস-এর প্রথম সংখ্যায়। পূর্ববঙ্গ এ-পত্রিকায় ঘোষিতভাবে আত্মীয় পরিগণিত হয়।

বিন্দু থেকে বৃত্তায়ত এই জীবন সুনীলের, একটু অনুসরণ করার প্রয়াস নেওয়া যাক কতখানি মসৃণ, উচ্চাবচ আর চড়াই-উৎরাই সমাকীর্ণ। '৪৭এর স্বাধীনতা সব তছনছ, ভু-ল, গোলমাল করে দিল। স্বাধীনতা নয়, দেশভাগ। শুরু হল পৃথিবীর অন্যতম করুণাদ্র একসোডাস, নতুন ইহুদীর তকমা উঠল বাঙালির গায়ে। আঁটোহওয়া জামা কা কে দিয়ে এসে কলকাতায় উপনীত হয়েছিলেন সুনীল, যে কলকাতা সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নিতান্তই নেতিবাচক? আস্তে আস্তে সইয়ে নিলেন নিজেকে, ধাতস্থ, ঘাতসহ করে নিলেন; সবাইকেই নিতে হয়।

পঁয়তালিশ টাকা মাইনের স্কুল শিক্ষক পিতা, চার সন্তান ও ভাড়াবাড়িসহ কী দুঃসহ জীবনযাপন করতে পারেন তার ধারাবিবরণী রয়েছে সুনীলের আত্মজীবনে, ও তারও চেয়ে অধিক বিভূতিভূষণের উপন্যাস, *অনুবর্তন*-এ। তাই বিস্ময় লাগে, তাঁর তের বছর বয়সে দেশভাগ, আর সব প্রতিকূলতা সামাল দিয়ে তার ঠিক ছবছ রের মাথায় *কৃত্তিবাস*। সুনীল তখন উনিশ, তখনো টিন এজার। এ এক মাজেজা বই কি।

সদ্য স্বাধীন দেশ। উদ্দীপনা তো আকাশে বাতাসে ছিলই। সারস্বত মঞ্চের সব সরণীতেই দেখা যাচ্ছে নওরোজ। নাটকচলি চ্চত্রস ঙ্গীতচি ত্রকলাসাহিত্য, নবতরঙ্গ সর্বত্র। ফিল্ম সোসাইটি গড়ছেন চিদানন্দসত ্যজিৎবংশীচ ন্দ্র গুপ্তরা; প্রমথেশ বড়ুয়াবিমল রায় দের জুর শেষ হয়ে ঋত্বিকনিমাই ঘোষসত ্যজিৎ দিগন্ত ভাসাতে আসছেন চলচ্চিত্রজগতে। অন্যদিকে চলচ্চিত্রঅভিন য়েও নতুন জোয়ার উত্তমঅনিল-বসন্তদের, সুপ্রিয়াসুচি ত্রাসাবি ত্রীমাধবী দের। নাটকে শম্ভু মিত্রউৎপল দ ত্তবাদল সরকার। গা নে মাতাচ্ছেন হেমন্ত-সন্ধ্যামান্নাধন ঞ্জয়উৎপলাসতীনাথ... সে বড় দীর্ঘ তালিকা। চিত্রশিল্পে ক্যালকাটা স্কুলপ্রকাশ কর্মকাররামান ন্দ-পরিতোষদের শুভ আবির্ভাব। আর সাহিত্য স্বর্ণপ্রসূ হয়ে উঠছে সংখ্যাতীত লেখকের দানে। তাই বলা চলে, এক মহান স্রোতের সমলয়সম্পন্ন হয়েই সেদিন দেখা দিয়েছিল *কৃত্তিবাস*, সংস্কৃতির গতিজাড্যে আনুকূল্য পেয়ে। এই হল পত্রিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। ইতিহাসের আরো একটু হদিশ নেব আমরা।

কৃত্তিবাস তরুণ কবিদের পত্রিকা। তাই বলে প্রবীণেরা পরিত্যাজ্য নন এখানে, তবে তাঁরা প্রবন্ধে আহূত হবেন কেবল। সমর সেন আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রদের গদ্য পাই তাই *কৃত্তিবাস*-এর প্রথম সংখ্যায়। পূর্ববঙ্গ এ-পত্রিকায় ঘোষিতভাবে আত্মীয় পরিগণিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'পাকিস্তানের তরুণ কবিরা আমাদের সমদলীয়, সমগোত্রীয়।' দু'দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কবি চ্ছেদ ঘটলেও সাংস্কৃতিক সেতু গড়ার এই যে শুভৈষণা, এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। অথচ তখনকার *কৃত্তিবাস*-কুশীলবদের খুব যে অবহিতি, তা কিন্তু নয়– ব্যক্তিগত পরিচয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৫৩-তেই যে বছর *কৃত্তিবাস* প্রকাশিত হয়, সেই বছরেই শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে শামসুর রাহমান এবং কায়সুল হক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতন এবং কলকাতাপ র্বে কিন্তু তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক এবং সমধর্মী কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, দেখা করেছেন তাদের চেয়ে প্রবীণদের সঙ্গে– আবু সয়ীদ আইয়ুব, নরেশ গুহ, সৈয়দ মুজতবা আলীদের সঙ্গে। অবিশ্যি তাঁদের সঙ্গে সুরজিত দাশগুপ্ত বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, শামসুরদের একমাত্র সমবয়সী। কিন্তু যেহেতু সুরজিৎ *কৃত্তিবাস*গোষ্ঠীর সঙ্গে সেসময় সম্যক পরিচিত নন, তাই কলকাতা পর্যন্ত এসেও *কৃত্তিবাস*-শামসুর যোগ হতে হতেও হতে পারল না তখন। *কৃত্তিবাস* তাই কেবল চতুর্থ সংখ্যা থেকে পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতা স্থান দিতে পারল।

তাহলে *কৃত্তিবাস* তথা সে পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক পূর্ববঙ্গের কবিদের বিবেচনায় আনলেন কী করে, ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও যাঁদের কবিতাগ্রন্থ পাঠের সুযোগও যখন ছিল না তাঁদের? পূর্ববঙ্গের কবিদের তাঁর *কবিতা* পত্রিকায় সাদরে স্থান দিতেন বুদ্ধদেব বসু, নিজে যিনি সাগ্রহে কলকাতার তরুণ কবিদেরও উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর পত্রিকায়। বুদ্ধদেবই অ দ্বয় সাঁকো দুবাংলার কবি - তরঙ্গের।

পাঁচের দশক এককভাবে পূর্ববঙ্গেও কিন্তু সাহিত্যে সাধারণভাবে, এবং বিশেষভাবে কবিতার সংসারে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং শামসুর রাহমান *কবিকণ্ঠ* নিয়ে যাত্রা করেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীন-সহযোগে। প্রকাশ শুরু হল আবদুলাহ্ আবু সাঈদের *কণ্ঠস্বর*, সিকান্দার আবু জাফরের *সমকাল*।

পাঁচের দশক এককভাবে পূর্ববঙ্গেও কিন্তু সাহিত্যে সাধারণভাবে, এবং বিশেষভাবে কবিতার সংসারে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং শামসুর রাহমান *কবিকণ্ঠ* নিয়ে যাত্রা করেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীন-সহযোগে। প্রকাশ শুরু হল আবদুলাহ্ আবু সাঈদের *কণ্ঠস্বর*, সিকান্দার আবু জাফরের *সমকাল*।

পাঁচের দশক এককভাবে পূর্ববঙ্গেও কিন্তু সাহিত্যে সাধারণভাবে, এবং বিশেষভাবে কবিতার সংসারে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং শামসুর রাহমান *কবিকণ্ঠ* নিয়ে যাত্রা করেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীনসহ যোগে। প্রকাশ শুরু হল আবদুলাহ্ আবু সাঈদের *কণ্ঠস্বর*, সিকান্দার আবু জাফরের *সমকাল*। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যসংকলনে পূর্ববঙ্গীয় কবিদের স্থান ছিল নিতান্তই পরিমেয়। সেই কবিকৃচ্ছ্রতা ঘোচাতে পূর্ববঙ্গ থেকে কবিদের কবিতার প্রথম সংকলনও প্রকাশিত হল, *নতুন কবিতা*। আবার, *কৃত্তিবাস*গোষ্ঠীর আড্ডা যখন কফি হাউস, খালাসিটোলা, দক্ষিণে সুরুচি, পূর্ববঙ্গের কবিকুল জড়ো হচ্ছেন মধুর ক্যান্টিন আর বিউটি বোর্ডিংয়ে। *কৃত্তিবাস* সমসাময়িক মুদ্রার অপর পিঠ পূর্ববাংলার কবিতার জগৎ, অতএব বোঝা গেল, স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন নির্মাণে স্থিতপ্রজ্ঞ।

এই চালচিত্রের অন্তর্গত করে যদি আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রমঅগ্রগতি লক্ষ্য করি তো দেখব, নানান ছোটবড় অনুঘটক তাঁকে ক্রমশ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আয়তন দিচ্ছিল। *কৃত্তিবাস*এর তিনি, কি ন্তু সেপত্রিকার চেয়ে আরো বহুগুণায়িত হয়ে উঠলেন তিনি, ছোট গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসে। কবিতা থেকে গদ্যে যাত্রা করেছেন এবং পরিহাসেরই বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, কবিতার জন্য অমরত্ব তাচ্ছিল্য করার মানস ব্যক্ত করেছেন যিনি, তিনি সাহিত্য একাডেমি বা আনন্দ বা বঙ্কিম পুরস্কার পান তাঁর গদ্যের জন্য। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করেছিলেন উত্তরবঙ্গের 'ত্রিবৃত্ত' কর্তৃপক্ষ। অতএব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথম স্বীকৃতি দেবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করাই হোক, আর কবি হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করার দায় পালনের জন্যই হোক, সুনীল-আখ্যানে 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কারকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতেই হবে। পরবর্তীকালে পুরস্কারপ্রাপ্তির অভাব হয়নি তাঁর জীবনে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক স্বীকৃতি এসেছিল যে-পুরস্কারটির মাধ্যমে, কুচবিহার থেকে যে পত্রিকা অঙ্কুরেই সুনীলপ্রতিভার স্বরূপ অনুভব করেছিল, তার গুরুত্ব একাধিক। কলকাতার বাইরের একটি পত্রিকা পুরস্কারদানের মত দাক্ষিণ্য দেখাতে পারে, এ বড় আহ্লাদের বিষয়, বিশেষ

সুনীল তাঁর গদ্যে, বিপুল গদ্যে কী বার্তা নিয়ে আসছেন, মূলত বিচার্য সেটাই। বঙ্গীয় পাঠকসমাজের উষ্মা, তিনি এত বেশি লিখেছেন কেন। হাস্যকর। এরাই আবার উচ্চকিত হতেন তিনি কম লিখলে, যেমন হাসান আজিজুল হক নিয়ে পাঠকের অভিযোগ। পরিমাণ-পরিমিতির স্বাধীনতা তো লেখকের প্রাপ্য, তাই না?

করে যখন ভেবে দেখি, কবি ও কবিতার অবিনশ্বর সুহৃদ বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা*ও কিন্তু ভাবেনি কবিকে পুরস্কৃত করার কথা। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল না কিছু, কিন্তু অনতি-তিরিশ সুনীল বরাবর গর্ব করে বলেছেন 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কারের তৈজস অনুভূতির কথা। হ্যাঁ, ১৯৭০এ চালু হওয়া 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কারের পূর্বসূরি অবিশ্যি ছিল *কৃত্তিবাস* পত্রিকাই আবার, যে পত্রিকা প্রথম পুরস্কার চালু করে ১৯৬৭ সালে, প্রাপক শামসের আনোয়ার। এপুর স্কারটি বর্তমানে যে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে সম্মানদক্ষিণা আর বইমেলার আলোকিত মঞ্চে পুরস্কারপ্রদানের মধ্য দিয়ে, স্বভাবতই সেই জৌলুস প্রথমদিকে ছিল না, তবে সেপ্রা ত্রিকা কবি চিনে নিতে ভোলেনি। দেবারতি মিত্র, তুষার রায়রা *কৃত্তিবাস*পুরস্কার পান, যখন তাঁদের কবিতার বই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

'ত্রিবৃত্ত' কিন্তু পুরস্কৃত করল কবি সুনীলকে নয়, ঔপন্যাসিক সুনীলকে। এর আগে *গড় শ্রীখ*- উপন্যাসের জন্য অমিয়ভূষণ মজুমদারের সঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে 'ত্রিবৃত্ত' দেওয়া হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেওয়া হল তাঁর *অর্জুন* উপন্যাস রচনার জন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার নন্দনকানন ছেড়ে ক্রমশ গদ্যের দিকে যেতে নিয়তিতাড়িত হচ্ছেন, চৈতন্যে পড়্যাঘাত হচ্ছে তবুও, এর নিহিতার্থ কী? সুনীলশুভার্থীদের আফসোস ও সুনীলভক্তদের আক্ষেপ-হতাশার আয়তন ছাড়িয়ে এর পেছনে বহুতর গূঢ় বার্তা আছে।

এখানে একটু কবিতা, কাব্য, সাহিত্য, গদ্য ইত্যাদি শব্দের জট ছাড়িয়ে নিতে চাই। প্রায়শই শোনা যায়, 'কবি ও সাহিত্যিক'। সুনীল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়েও দেখি, অনেকেই লিখছেন, সুনীল এত এত উপন্যাস লিখলেও মূলত কবি। না, ঔপন্যাসিকও কবি। কী এরিস্টটলে কী বিশ্বনাথ কবিরাজে, সাহিত্য কাব্যের সমার্থক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা এও ব লেছেন, 'গদ্যঃ কবীনাং নিকষা বদন্তি', গদ্যরচনার মধ্য দিয়ে কবির যথার্থ কবিত্বশক্তির পরীক্ষা। কাব্যের মধ্যে নাটককে আবার বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ– 'কাব্যেষু নাটকম্ শ্রেষ্ঠম।' এরিস্টটল Poetics বা কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে মূলত কিন্তু আলোচনা করেছেন নাটক নিয়ে। রসাত্মক বাক্যই হচ্ছে কাব্য, তা পদ্যে বা গদ্যে, যাতেই লেখা হোক। মূল ও আদি অর্থে কেন যে আমরা 'কাব্য' শব্দটিকে নিই না! কেউ 'কবি ও সাহিত্যিক' বলার অর্থ বিধানচন্দ্র রায় 'ডাক্তার ও চিকিৎসক' বলা। তাই গল্প উপন্যাস লিখলেও, এবং এমনকি সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি হতে থাকলেও সুনীল কাব্যেই ছি লেন, রসাত্মক বাক্যেই ছিলেন।

বিচার্য গদ্য বা পদ্য নয়, বিচার্য একজন সাহিত্যনির্মাতা তাঁর লেখার মাধ্যমে কী সাধন করতে চান। রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দও গদ্য লিখেছেন পদ্যের তুলনায় ঢের ঢের বেশি, এমন কি কাজী নজরুলের, পরবর্তীকালে শামসুর রাহমান এবং বিশেষ করে আল মাহমুদের গদ্য তাঁদের পদ্যের পরিমাণকে ছাপিয়ে যায়। সুনীল তাঁর গদ্যে, বিপুল গদ্যে কী বার্তা নিয়ে আসছেন, মূলত বিচার্য সেটাই। বঙ্গীয় পাঠকসমাজের উষ্মা, তিনি এত বেশি লিখেছেন কেন। হাস্যকর। এরাই আবার উচ্চকিত হতেন তিনি কম লিখলে, যেমন হাসান আজিজুল হক নিয়ে পাঠকের অভিযোগ। পরিমাণপরিমিতির স্বাধীনতা তো লেখকের প্রাপ্য, তাই না?

গদ্যকার হিসেবে সুনীলের সার্থকতার প্রাথমিক প্রমাণ হল, তাঁর মাত্র তিনটে উপন্যাস প্রকাশিত হতেই তাঁর উপন্যাসকৃতি নিয়ে *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় ঔপন্যাসিক সুনীল নিয়ে প্রথম অনুপুঙ্খ বিশেষণ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার তাঁর মাত্র পাঁচটি কি ছ'টি উপন্যাস প্রকাশিত হতেই তাঁর দু'টি উপন্যাস নিয়ে ছবি তোলার তাগিদ অনুভব করলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর '৭১এ 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার পরের বছর আরো বৃহত্তর পুরস্কারে অন্বিত করল তাঁকে, 'আনন্দ পুরস্কার'। এই ঘটনাসমূহের পেছনে কোন্ কারণ সক্রিয়? নাকি নেহাৎ কাকতালীয় এসব?

না, সুনীলের এই প্রাথমিক অর্জনের পেছনে তাঁর যে বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করতে চাই আমরা, তা হল সমসাময়িকতা। নিজের সময়কে নিজ করপুটে ধরতে পেরেছিলেন তিনি, হাতে আমলকির মত মুঠিবদ্ধ করে নিয়ে ছিলেন সময়ের শিরাউপশিরা। গ ল্পউপন্যাসে সমসময়ের প্রতিফলন এই প্রথম পেলাম আমরা, সরাসরি। *যুবক যুবতীরা, আত্মপ্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, জীবন যে রকম* এবং *অরণ্যের দিনরাত্রি* উপন্যাস চারটিতে ষাটস ত্তর দশকের তারণ্যের ক্লোজ আপ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা অভিনবত্ব নিয়ে এল। সত্যজিৎমান বেন্দ্রও প্রতিক্রিয়া জানালেন এই সমসাময়িকতা-র শুভাবির্ভাবকে কুর্নিশ জানাতে। সেসময়কার মুখ্য উপন্যাসকার যাঁরা, তারাশঙ্করনারায়ণ গ ঙ্গোপাধ্যায়বিমল মিত্র ছাড়িয়ে যখন বিমল করসম রেশ বসু-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীতে এসে পড়ল, বা শংকরশী র্ষেন্দুপ্র ফুল- রায়অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তাঁদের নিজস্ব ভূমি ছিল কিন্তু এই সমসময়ের প্রতি মগ্নতা ছিল না, বিশেষ করে অধুনার পাপ ও পুণ্যের সালতামামি নিয়ে সুনীল যেভাবে ডানা মেললেন, মুহূর্তেই তাঁর জয় নিশ্চিত করে নিলেন।

হ্যাঁ, এজন্য কৃত্তিবাসীয় জীবনযাপন ও সেই সঙ্গে *আনন্দবাজার পত্রিকা*গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্তি সুনীলকে নির্মাণ দিচ্ছিল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহও যে পরোক্ষ প্রভাব ফেলেনি, তা বলা যাবে না। আর রয়েছে এসময়, প্রায় অলৌকিকভাবে, তাঁর এক বছরের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকাযাত্রা। সৌজন্য, পল এঙ্গেল। সুনীল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনও সে কথা, 'পল এঙ্গেলের সেই আমন্ত্রণপত্রটি এমনই একটা আকস্মিক ঘটনা যা আমার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।'

পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল এর কিছু আগে থেকেই, যখন তিনি *আনন্দবাজার পত্রিকায়* ফ্রি লানসিং করছিলেন। নানান বিচিত্র বিভাগ দেখতে হত তাঁকে এখানে, পাত্রপা ত্রীর কলাম, সাহিত্যের পাতা, দেশবি দেশ নিয়ে যে বিভাগ ছিল, এইসব। সেখানেই নিয়মিত বহু ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাত, যাঁদের মধ্যে বিদেশ থেকে আগতরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন বিখ্যাত জাপানি লেখক মিসিমা, তেমনি বিখ্যাত ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেনডার, মার্কিন কবয়িত্রী রুথ স্টেফান, বিট কবি গিনসবার্গ ও তাঁর সমকামী বন্ধু পিটার। আর অন্তিম নামটি পল এঙ্গেল। *কৃত্তিবাস*ব ন্ধনীর বাইরে সুনীলের গায়ে এই আন্তর্জাতিকতার হাওয়া লাগছে, ফরাসি শিখছেন কমলকুমার মজুমদারের কাছে, কাওয়াবাতার রচনায় মগ্ন হচ্ছেন, অপর জাপানি ঔপন্যাসিক ওসামু দাজাইএর লেখায় আগ্রহী হচ্ছেন, *কৃত্তিবাস* নিজস্ব বন্ধুদের কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের গণ্ডী ছাড়িয়ে চিনা

...হাতে আমলকির মত মুঠিবদ্ধ করে নিয়ে ছিলেন সময়ের শিরা-উপশিরা। গল্প-উপন্যাসে সমসময়ের প্রতিফলন এই প্রথম পেলাম আমরা, সরাসরি। যুবক যুবতীরা, আত্মপ্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, জীবন যে রকম এবং অরণ্যের দিনরাত্রি উপন্যাস চারটিতে ষাট-সত্তর দশকের তারণ্যের ক্লোজ আপ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা অভিনবত্ব নিয়ে এল।

পল এঙ্গেল, যিনি একজন রোডস স্কলার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান, কলকাতা এসে মিলিত হয়েছিলেন *কৃত্তিবাস*গোষ্ঠীর প্রায় সব কবির সঙ্গে, অনুবাদে শুনেছেন তাঁদের কবিতা। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অন্তর্গত রাইটার্স ওয়ার্কশপে যোগ দিতে এঙ্গেল আমন্ত্রণ জানালেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। কেন না এঙ্গেলের মনে হয়েছিল, একটি গরিব দেশে দারিদ্র্য উপেক্ষা করে নিয়মিত কবিতা পত্রিকা বার করার ইতিবাচকতা যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য।

কবিতার অনুবাদসংকলন বার কর ছে দিলীপ দত্তের অনুবাদে, এহেন গতিজাড্যের সদর্থক পরিণাম ঘটল ১৯৬৩র ঊনত্রিশ বছর বয়সী সুনীলের আইওয়া যাত্রায়। পল এঙ্গেল, যিনি একজন রোডস স্কলার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান, কলকাতা এসে মিলিত হয়েছিলেন *কৃত্তিবাস*গোষ্ঠীর প্রায় সব কবির সঙ্গে, অনুবাদে শুনেছেন তাঁদের কবিতা। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অন্তর্গত রাইটার্স ওয়ার্কশপে যোগ দিতে এঙ্গেল আমন্ত্রণ জানালেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। কেন না এঙ্গেলের মনে হয়েছিল, একটি গরিব দেশে দারিদ্র্য উপেক্ষা করে নিয়মিত কবিতা পত্রিকা বার করার ইতিবাচকতা যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য। তাছাড়া, সুনীলের কবিতা ভাল লেগেছিল এঙ্গেলের। ১৯৫৭-তে একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থের অতি ক্ষীণ সহায়কে সম্বল করে (*একা এবং কয়েকজন*) সুনীলের হেমবর্ণ জাগরণের প্রস্তুতি শুরু হল।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আরো একবার পরখ করার দরকার হবে। ১৯৬৩, অর্থাৎ স্বাধীনতা এখন ষোড়শী, এবং এর মধ্যে ভারতকে দুদুবার যু দ্ধে জড়াতে হয়েছে, ১৯৪৭এর স্বাধীনতার দোসর হয়েই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারতের লড়াই, আর ১৯৬২-তে ভারতচি নের যুদ্ধ, যা আরো অধিক তাৎপর্যবাহী। এর ফলে প্রতিরক্ষায় ব্যয় বাড়বে বহুগুণ, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় ব্যয়বৃদ্ধি ঘটাবে পাকিস্তান; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হবে; আরো আরো ঘটনার আবর্তে এদেশ রাজনৈতিকঅর্থনৈতিক দুরূহতার অধীন হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতমার্কিনের ঠাণ্ডা লড়াই ঘনত্বলাভ করবে, ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিনি তৎপরতা বাড়বে, বাড়বে পেট্রোডলারের দাপটে সহসাধনী হওয়া দেশগুলিতেও। সুনীল যখন আমেরিকায়, তখন সেখানে কেনেডির রাষ্ট্রপতিত্ব। কিউবায় কাস্ত্রোর প্রশ্নে, ক্রুশ্চেভের সঙ্গে পরমাণু অস্ত্রসংবরণ প্রশ্নে, মহাকাশ বিজ্ঞানে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রশ্নে তিনি বিতর্কিত হয়ে আছেন আজও। আবার কেনেডিই একমেব মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি সাহিত্যরচনায় পুলিৎজার পুরস্কার পান তাঁর 'Profiles in Courage' গ্রন্থের জন্য, যাঁর খাদ্যপ্রীতি তাঁকে ফ্রান্স থেকে রাঁধুনি, শেফ নিয়ে আসায় প্ররোচিত করে, আর কবিরা তাঁর কাছে এমনই সম্মানার্হ যে মার্কিনি ইতিহাসে সর্বপ্রথম কেনেডির রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন রবার্ট ফ্রস্ট স্বরচিত কবিতা পড়তে আমন্ত্রিত হন।

তবে সব মিলিয়ে বিশ্ব ব্যবস্থা ক্রমশই দুরূহতা-মর্মান্তিকতার দিকে যাচ্ছে, 'Things fall apart;/ the centre connot hold।' উপমহাদেশে একদিকে নেহরু অন্যদিকে আইয়ুবের দ্বৈরথ, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অন্তর্কলহ, পরে তারা পৃথগন্ন হবে ১৯৬৪-তে, সাহিত্যে হাংরি আন্দোলন, পূর্ববঙ্গে '৬১র রবী ন্দ্রবিরোধিতা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, পাকিস্তানব্যাপী আইউবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামক সোনার পাথরবাটির ইস্তেমাল, সে বড় সুখের সময় নয়। এক বছরের প্রবাসবাসের পর দেশে ফিরে এলে এসবের অভিঘাত এসে পড়বে সুনীলের জীবনযাপন ও সাহিত্যকর্মে, পদ্য থেকে গদ্যে চলে আসতে হবে তাঁকে স্রেফ জীবনযাত্রা নির্বাহের তাগিদে, যা চিনযুদ্ধপরবর্তী সময় থেকে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে, যা কঠিনতর হয়ে উঠবে '৬৫র ভারতপাকি স্তান যুদ্ধের পর থেকে। সুনীলের গদ্য-আশ্রয় প্রাথমিকভাবে তাই দেশের টাকাআনাপাই য়ের হাস্যকর হতাবস্থা থেকে। তাই আশ্চর্য নয়, ৬/৬/১৯৬৬-তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী টাকার অবমূল্যায়ন ঘটালেন আর সেই বছরেই ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জাত হলেন *যুবক যুবতীরা* আর *আত্মপ্রকাশ* দিয়ে।

গদ্য দিয়ে পিতৃপক্ষের সূচনা সুনীলের, কিন্তু তার আগে সোনার সুতোয় গাঁথা *অন্য দেশের কবিতা*, তাঁর দেবীপক্ষের অপরূপ ও শান্ত উপহার। এমন নয় যে, যেপাঁচটি ইউরোপীয় কবি সুনীলের অনুবাদে পেলাম এখানে (ফরাসি-ইতালীয়জর্মন-স্প্যানিশ ও রুশ), তাঁদের অনুবাদে এর আগে পাইনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথরবী ন্দ্রনাথনালিনীকান্ত গুপ্ত থেকেই কমবেশি অনূদিত এঁরা। সুনীলের একক প্রয়াসের আগে অলোকরঞ্জনশঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় ঈর্ষণীয় ও বিপুলায়তন অনুবাদগ্রন্থ ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে, *সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত*।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের কবি, কথাসাহিত্যিক

ছোটগল্প

ছায়াপথ

ঋতা বসু

তেলটা ভাল করে গরম হবার আগেই নীলা দায়সারা করে কাটা বড়ো বড়ো বাঁধাকপির পাতাগুলো কড়াইয়ে ঢেলে দিল। অসময়ের কপির বোটকা গন্ধে গুমোট রান্নাঘরের বাতাস আরও ভারি হয়ে উঠল। এত জোরের সঙ্গে খুন্তিটা দিয়ে পাতাগুলো ওপরনিচ করল যে আর একটু হলেই কড়াইটা উলটে যেত। যাক– মনের জ্বালায় নীলা হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। মুরারির 'না' কে যে 'হ্যাঁ' করানো যাবে না, তা সে জানত। তবু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুরারির সেই এক কথা– টিভি আমি এখন কিনব না।

– কেন কিনবে না? মেয়েটা এর বাড়ি ওর বাড়ি টিভি দেখে বেড়ায় হ্যাংলার মত, সেটা ভাল লাগে?

– না, লাগে না। যেতে দাও কেন?

– কী করবে এই এক চিলতে ঘরের মধ্যে? স্কুলের পর অতখানি সময় কাটাবে কী করে?

– কেন, স্কুলের পড়াশোনা নেই? অত টাকা খরচ করে তোমাকে গ্যাসের উনুন এনে দিলাম যাতে সকাল সন্ধে সময় করে মেয়েটাকে নিয়ে বসতে পার। এ তল্লাটে কার আছে এমন সুবিধে, বলতে পার? সুবিধে হয়ে উলটো ফল হল। হাতে অজস্র সময় পেয়ে মা মেয়েকে

পড়াশোনা করে কত দূর কী হয়, নীলার হাড়ে হাড়ে জানা আছে। বিয়ের পর এই পাড়ায় আসা থেকেই শুনছে সুধাদার দুই মেয়ে অঞ্জু মঞ্জু দু'টি রত্ন। চারপাশে পাঁচছয় ক্লাস পড়াদের মাঝখানে মাধ্যমিক পাস করল। কলেজে গেল। তারপর কী হল? না, একজন কর্পোরেশন স্কুলের দিদিমণি। আর একজন দুধের ডিপোয় জালবন্দি। পিংকির ওই রকম জীবনের কথা নীলা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

বগলদাবা করে পাড়ায় পাড়ায় টিভি দেখে বেড়াচ্ছে। একটানা কথা বলে মুরারি দম নেবার জন্য একটু থামল। হাতের থলিতে গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে ঠিক করা প্রেসার কুকারটা ভরে উঠে দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা চাপা। মাথা একটু নিচু করে ঢুকতে বেরোতে হয়। নীলা যে কতবার ঠোকর খেয়েছে তার ঠিক নেই। মুরারি দরজার কাছে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল– তোমাকে আগেও বলেছি আবারও বলছি, আমাদের পড়াশোনা হয়নি। পেছনেও কেউ ছিল না। আমার জীবনে এই একটাই সাধ, পিংকিকে পড়াব– যতদূর ও পড়তে চায়। তার জন্য দরকার হলে শেষ পাইপয়সাটা পর্যন্ত খরচ করব। তুমি মেয়েটাকে নষ্ট করে দিয়ো না।

মুরারির এই অত্যন্ত সাবধানে মাথা বাঁচিয়ে চলার দৃশ্যটা নীলা যতবার দেখে ততবারই তার গা রি রি করে ওঠে। এই লোকটা কোনদিন মাথা উঁচু করে চলবার মত জীবনে পৌঁছতে পারবে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। চারপাশের পৃথিবী যে কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে সে সম্বন্ধে সামান্য ধারণাও যদি থাকত তাহলে মেয়েকে বিদ্যাধরী বানিয়ে রাজরানি করার স্বপ্ন দেখত না।

পড়াশোনা করে কত দূর কী হয়, নীলার হাড়ে হাড়ে জানা আছে। বিয়ের পর এই পাড়ায় আসা থেকেই শুনছে সুধাদার দুই মেয়ে অঞ্জু মঞ্জু দু'টি রত্ন। চারপাশে পাঁচছয় ক্লাস পড়াদের মাঝখানে মাধ্যমিক পাস করল। কলেজে গেল। তারপর কী হল? না, একজন কর্পোরেশন স্কুলের দিদিমণি। আর একজন দুধের ডিপোয় জালবন্দি। পিংকির ওই রকম জীবনের কথা নীলা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

যার নাম মুরারি তার নজর আর কতদূর যাবে? ওই জন্যই তো নীলার এখানে বিয়েতে ইচ্ছে ছিল না। কেউ কখনও শুনেছে একটা তিরিশ বছর বয়সের ছেলের নাম মুরারি? মাবাবা ছেলের স্বভাবচরি ত্রের খোঁজ নিয়ে ছেলে দেখে একেবারে মুর্ছা গেল। কী– না পরের বাড়িতে খেয়ে পরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মত মানুষ হয়েছে। নাগেরবাজারে বাসা নেওয়াই আছে। বিয়ের পর কাকা কাকির সংসার ছেড়ে বউ নিয়ে আলাদা থাকবে। বাজারে নিজস্ব দোকান। এর থেকে আর বেশি কী চাই?

প্রেসার কুকার, স্টোভ ইত্যাদি মেরামতির দোকানকে বাবা যখন স্বাধীন ব্যবসা বলে পাঁচজনের কাছে গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় নীলার হাসি পায়। তাও যদি টিভি রেডিওর দোকান হত।

বাপের বাড়িতে গেলে বউদির নিত্য অভিযোগ– তুমি কত ভাল আছ! আমাদের মত নুন আনতে পানতা ফুরোয় না। যেন দু বেলা ডালভাতটাই সব। বউদির একটানা ঘ্যানঘ্যানানির মাঝে নীলা একদৃষ্টে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে। পিংকি ঐশ্বর্য রাইয়ের নাচটা যদি তুলতে পারে তাহলে আজ বাপের বাড়ি আসাটা সার্থক হয়। আগের দিন সবে শিল্পীর নাচটা বোঝবার চেষ্টা করছে, অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। আজ ভালয় ভালয় আলোটা থাকতে থাকতে পিংকি নাচটা তুলে নিলেই বাড়ির দিকে দৌড়োবে। মুরারি আসার আগেই বাড়ি ঢুকে পিংককে বই খাতার সামনে বসিয়ে দেবে।

ঐশ্বর্য রাই কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশটা সামনের দিকে ছোবল মারার ভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে। নীলা লক্ষ্য করল– পিংকি নকল করতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু হচ্ছে না। ঠিক এই জন্যই নীলা একটা নিজস্ব টিভি চায়। একবার দেখে এসব শক্ত জিনিস তোলা যায় না। আবার হয়তো নাচটা দেখাবে কিন্তু ওরা জানতেও পারবে না। মরে যাওয়া ঝাঁজটা আবার নতুন করে টের পায় নীলা।

এখন হৃতিক রোশনকে ঘিরে একপাল ছেলে মেয়ে। এই ছবিটা খুব হিট করেছিল বলে টিভিতে বারবার দেখিয়েছে। সেই জন্যই শক্ত হওয়া সত্ত্বেও পিংকি নাচটা ভালই তুলেছে। নীলার ভঙ্গিতে বাহবা ফুটে ওঠে। পিংকির দেখাদেখি নাচের তালটা মৃদুভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারও রক্তের মধ্যে।

বউদি বিরসভাবে বলল– তোমাদের সঙ্গে তো কথাই বলা যায় না, এসেই মা মেয়ে টিভির গায়ে সেঁটে থাক।

সকালের রাগটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে নীলার। মুরারিকে কিছু না বলতে পারার ক্ষোভ উগুল করে নেয় বউদির ওপর– খুব ভাত্কাপড় দেখাচ্ছিলে না এতক্ষণ, তোমাদের যেটা জোটে না। তা সত্ত্বেও তোমাদের টিভি আছে।

নীলার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় ভয় পেয়ে পিংকি নাচ থামিয়ে দেয়। মা মেয়ের জন্য চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে এসে নীলার উষ্মার কারণটা বোঝবার চেষ্টা করেন। নীলা কোনদিকে না তাকিয়ে বলে চলে– তোমরা সেদ্ধ পানতা যা হোক খেয়ে নিজেদের ঘরে বসেই আনন্দ করতে পার কারণ তোমাদের সে ব্যবস্থা আছে। আমরা মাছ ভাত খেয়েও লোকের দোরে দোরে ঘুরে মুখ নাড়া খেতে হয়, কারণ খাওয়াটাই জীবনের সব নয়– বুঝেছ।

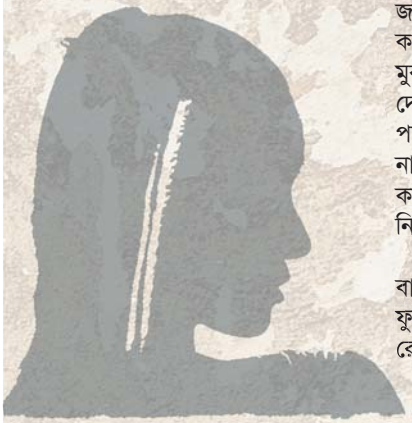

রাগেদুঃখে নীলার চোখ জ্বালা করে ওঠে। মাথাটায় কেমন অস্থির পাগল পাগল ভাব। চৌকি থেকে নেমে পিংকির হাত ধরে 'চল্– বাড়ি চল্–' বলে পায়ে চটি গলিয়ে কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না করেই সে বেরিয়ে পড়ে। ভুলেই যায় যে মা ওরই জন্য পাড়ার দোকান থেকে তেলেভাজা আনিয়েছিল চায়ের সঙ্গে খাবে বলে।

বাড়ি আসতে আসতে নীলা মনস্থ করে ফেলে টিভি সে কিনবেই। মুরারি যাই বলুক না কেন, সে পরোয়া করবে না। রতনদারা বড়ো টিভি কিনেছে বলে ছোটটা সস্তায় বিক্রি করবে। দরকার হলে দুটো চুড়ি বিক্রি করবে সে। বাকিটা সংসার খরচ থেকে অল্প অল্প সরিয়ে মাসে মাসে শোধ করবে।

পাড়ায় ঢুকতেই একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগল। নমিতার ছেলের বল ড্রেনের মুখে আটকে জল জমেছে। তার মধ্যে কে কুচো চিংড়ির খোসা ফেলেছে– তার আঁশটে গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। নমিতার বর একটা লাঠি দিয়ে ড্রেনের মুখটা খোঁচাবার চেষ্টা করছে। মুক্তির মা বল খেলোয়াড়দের শাপ শাপান্ত করছে। জায়গায় জায়গায় তরকারির খোসা, পলিথিনের ঠোঙা আর রাজ্যের আবর্জনা। লাঠির খোঁচায় জমা জলটা দুলে উঠছে আর পচা গন্ধটা দ্বিগুণ বেগে নাকে এসে ঝাপটা মারছে। মজা দেখতে ভিড় করেছে যত নিষ্কর্মার দল। নীলার দম আটকে আসে। এই মানুষজন, এই পরিবেশের বাইরে তাকে বেরোতেই হবে। আর তা এমন কিছু অসম্ভব নয় জানার পর থেকেই নীলার যেন আরও অসহ্য লাগছে এই কুৎসিত বাতাবরণ।

মুরারি তার মধ্যবিত্ত নৈতিকতা আর দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে যে মন্টাকে চিরকাল অকালকুষ্মা- রাঙামুলো বলে গাল দিত, যাকে পাড়াপড়শি বাদের খাতায় ফেলে রেখেছিল, সারাদিন লম্ফঝম্ফ আর বিনা কারণে মারামারি করা ছাড়া যার আর কোন কাজ ছিল না– সেই মন্টা প্রথমে দুচারটি টিভি সিরিয়াল ক রে টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়া হয়ে যখন বম্বে পৌঁছল, তখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা সকলের কাছে ঝাপসা ছিল। মাস তিনেক আগে এক সুটিং পার্টির সঙ্গে দার্জিলিং যাবার পথে কলকাতার বাড়িটা একবার বুড়িছোঁয়া করে গেল। মন্টার পোশাকের ঘটা, চেহারার জেল্লা, কথাবার্তার ছটায় তখন সকলের মুহ্যমান অবস্থা।

নীলার সঙ্গে আড়ালে আবডালে ওর একটু হাসাহাসি চোখাচোখির ব্যাপার ছিল। সেই সম্পর্কের জেরে আধঘণ্টার জন্য উঁকি মেরেছিল নীলার ঘরে। নীলা জিজ্ঞেস করেছিল– আলাদীনের প্রদীপ পেয়েছ নাকি?

মন্টার বোধহয় গল্পটা জানা ছিল না। একহাত দিয়ে অন্য হাতের সুঠাম বাহুমূলে চাপড় মেরে বলল– এ তার থেকেও বড় জিনিস। শুধু শরীরটাকে সম্বল করে লড়ে গেলাম। এখন মনে হয় এখানে ছিলাম কী করে এতগুলো বছর? মন্টার জুতো ঘড়ি হাতের সোনার ঢিলে মণিবন্ধ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল।

নীলার বুকের ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে যায়। মন্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘর এবং তার অতি সাধারণ অঙ্গসজ্জা, এত অকিঞ্চিৎকর মনে হয় যে, তার কেমন যেন অসহায় লাগে। সে মন্টাকে জিজ্ঞেস করে– কী করে হল এত সব?

আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি মন্টার সমস্ত ভঙ্গিতে। সে বলে– ও বাবা, সে বলতে গেলে মহাভারত। সারারাত লেগে যাবে। বরের থেকে পারমিশন করিয়ে আমার সঙ্গে চল্, সব গল্প শোনাব। এই কথাগুলো মন্টা সামান্য গলা খাটো করে তরল একটা ভঙ্গিতে বলেছিল। নীলার শুনতে খারাপ লাগেনি। মন্টার কথাবার্তায় সে এমন একটা জগতের আভাস পেয়েছিল যেখানে সবই বড়ো আনন্দময়। সেখানে কেউই কারও জন্য হা হুতাশ করে না। চোখের জল ফেলে না। তুমি পা মেলাতে পারলে ভাল, নয়তো অন্য কেউ আছে। কোন জবরদস্তি নেই। এই চিরবসন্তের জগতে অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য শামিল হতে নীলার খুবই ইচ্ছে করেছিল। পরে ভেবেছে মন্টার সঙ্গে সেই আনন্দের স্থায়িত্ব কতটুকু? কয়েক ঘণ্টাই তো। অথচ মন্টা আসার আগে জানতেই পারেনি চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকতে পারার মত সম্পদ তার ঘরেই মজুত।

নাচ পিংকির রক্তে। ওকে আর একটু ঘষামাজা করে পরিবেশন করতে পারলে কাজের অভাব নেই। পয়সা এখন এই লাইনেই উড়ছে। প্রায় প্রতিটি নাচের দৃশ্যে সখ্মী সখীদের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। তার ওপর আছে স্টেজ শো। মন্টা বলছিল– আজকাল নায়ক্কনায়িকা দের থেকে জুনিয়র আর্টিস্টদের ব্যস্তমতা বেশি, কারণ তারা সকলের সঙ্গেই আছে। ঢোকাটাই শক্ত। ঠিকঠাক ছকে পড়ে গেলে আর ভাবনা নেই। এখন আবার বাচ্চা নাচিয়েদেরও চাহিদা বাড়ছে।

তারপর নীলার শরীরের ওপর থেকে নিচে একবার চোখ বুলিয়ে বলেছিল– পিংকি বাচ্চা মেয়ে। ও নিজে আর কী চেষ্টা করবে! নিজে তো চেহারাটা বেশ চাকুমচুকুম রেখেছ। একবার লড়ে যাও না মেয়ের জন্য।

মন্টার কথা থেকে সাবধানে সবই প্রায় বাদ দিয়ে দু একটি মাত্র বাক্য চয়ন করে মুরারিকে বলামাত্র সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল– একটা পড়াশোনার মাস্টার রাখতে পারছি না আর তুমি এলে নাচের মাস্টারের বায়না নিয়ে।

– যার যে দিকে ঝোঁক সেদিকেই তো যাওয়া উচিত।

– তুমি আর আমাকে উচিত দেখিয়ো না। ওই ঝোঁক আমি বদলে দেব।

মুরারির প্রতিরোধের তীব্রতা অনুভব করে নীলা তাকে আর ঘাঁটায়নি। তবে তারপর থেকেই পিংকিকে আরও বেশি করে অনুশীলনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যা ছিল নিতান্তই

নাচ পিংকির রক্তে। ওকে আর একটু ঘষামাজা করে পরিবেশন করতে পারলে কাজের অভাব নেই। পয়সা এখন এই লাইনেই উড়ছে। প্রায় প্রতিটি নাচের দৃশ্যে সখ্মী সখীদের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। তার ওপর আছে স্টেজ শো। মন্টা বলছিল– আজকাল নায়ক্কনায়িকা দের থেকে জুনিয়র আর্টিস্টদের ব্যস্তমতা বেশি, কারণ তারা সকলের সঙ্গেই আছে। ঢোকাটাই শক্ত। ঠিকঠাক ছকে পড়ে গেলে আর ভাবনা নেই।

খেলার ছলে মজা করা, তাই এখন নীলার ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্ন। মুরারির গোঁয়ারতুমির জন্য নীলা সেই উজ্জ্বল আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে না।

পিংকিকে ঘরে ঢুকিয়ে নীলা নাক চেপে দুর্গন্ধময় জায়গাটা পার হয়ে রতনের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। রতন একটা বাচ্চা ছেলেকে চারটে চাউয়ের প্যাকেট দিয়ে ক্যাশবাক্সের ডালা খুলতেই এক গোছা নোট নীলার চোখে পড়ল। নীলা দরাদরির আগে রতনের চোখের ভাষা বোঝবার জন্য আঁট করে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিজের অঙ্গপ্‌-ত্যঙ্গ প্রকট করে নিল। রতন বাক্স বন্ধ করে নীলার দিকে তাকাল। ঝানু ব্যবসাদারের কৌতূহলহীন নির্বিকার চাউনি।

পিংকিকে ঘরে ঢুকিয়ে নীলা নাক চেপে দুর্গন্ধময় জায়গাটা পার হয়ে রতনের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। রতন একটা বাচ্চা ছেলেকে চারটে চাউয়ের প্যাকেট দিয়ে ক্যাশবাক্সের ডালা খুলতেই এক গোছা নোট নীলার চোখে পড়ল। নীলা দরাদরির আগে রতনের চোখের ভাষা বোঝবার জন্য আঁট করে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকট করে নিল।

নীলা বলল, তোমার টিভিটা আমি নেব। যা দাম চেয়েছ দেব, কিন্তু সবাই জানবে তুমি ওটা অমনি ক'দিন আমার কাছে রেখেছ। খদ্দের পেলে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে?

– ঠিক আছে। রতন গেঞ্জি তুলে পেট চুলকোতে চুলকোতে বলে– আমার দাম পাওয়া নিয়ে কথা, তারপর তুমি যা খুশি তাই বল না কেন।

ময়লা চাদরের মত ধোঁয়া ধুলোয় ঢাকা সার সার ঘর, খোলা নর্দমা, অসুন্দর মলিন নারীপুর ুষদের দিকে তাকিয়ে নীলা ভাবল, এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে যে কোন দাম দিতে রাজি।

দুই.

কলকাতায় শো করতে আসা এক ঝকমারি। প্রায় তিন বছর বাদে বাপ্পাদিত্য এবার কলকাতায় এল। তার মধ্যে শরীরটা ক'দিন ধরেই গোলমাল করছে। এর ওপর একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই আছে। সস্তা হবে বলে কলকাতায় জুনিয়র আর্টিস্টদের জন্য যে পোশাকগুলো দুমাস আ গে অর্ডার দিয়েছিল তার মাপ ঠিক হয়নি। শেষ মুহূর্তে এখন আর কিছু করারও নেই। জুনিয়র আর্টিস্ট বলেই তাদের দাবড়ে ঠাণ্ডা করা গিয়েছে। আলোর লোকটার তো এতক্ষণে আসা উচিত। সেন্ট্রাল ব্রুয়ারিসের দুটো চেক এখনও জমা পড়েনি। ইকবাল গাড়ির পেমেন্ট করতে সেই যে নিচে গেল আর পাত্তা নেই।

ইকবালকে ছাড়া বাপ্পাদিত্য আজকাল চোখে অন্ধকার দেখে। আড়মোড়া ভেঙে বেডসাইড টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে ইকবালকে ফোন করার আগেই সেটা বাজল।

– ড্রিংকস পাঠিয়ে দেব?

এই হল ইকবাল। মুখে উচ্চারণ করার আগেই বুঝে যায় কী দরকার।

একবার রিহার্সালটা দেখতে গেলে হত। কিন্তু বিছানাই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। কী যে জ্বর জ্বর সর্দি ভাব হয়ে আছে। কিছুতেই বাপ্পাদিত্য উৎসাহ পাচ্ছে না। দলের একটা মেয়ে দুবার নক ক রে গেল।

চেনা চেনা মুখ। মুখ না শরীর? এই মেয়েটাই কি ছিল ভোপালের শো তে? দুরাত ছিল বা প্পাদিত্যের সঙ্গে। ভাল করে মনেও পড়ে না। কত যে এল গেল। সব ক'টাকেই একরকম লাগে। মেয়েগুলোকে দেখলে আজকাল বিবমিষা হয়। দামি মদ, সুস্বাদু খাবার, সবই মুখে বিস্বাদ লাগছে। অথচ এই হোটেলের কাবাব তার কী প্রিয় ছিল। বম্বে থেকে এসে বরাবর এখানেই ওঠে। হোটেলের বেয়ারাবাবুর্চি সবাই ইয়ার দোস্ত। যে নেপালি মেয়েটা বাপ্পাদিত্য এলে তার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে থাকত– হোটেলেরই পি আর ডিপার্টমেন্টের স্টাফ ছিল– এবার আর তাকে দেখতে পায়নি। সে নাকি কাজ ছেড়ে দিয়েছে। বুড়ো বেয়ারা বৈজু বেফাঁস বলে ফেলেছে– উনকো দেহান্ত হো গিয়া।

সেই থেকে শরীরটা আরও খারাপ লাগছে। বাপ্পাদিত্যকে কি শেষ পর্যন্ত ইউপ্লির কোয়াকের সেই টোটকাটা প্রয়োগ করতে হবে নাকি? রক্ত পরীক্ষার ফলাফল জানার পর এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই শুনেও যেন তার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছিল না। এই ভরপুর জীবনের মাঝখান থেকে চলে যেতে হবে, এ যেন অবিশ্বাস্য। তাই ইকবালের পরামর্শ মত তার সঙ্গেই গিয়েছিল ইউপ্লির এক হাকি মের কাছে। সে এই কাল রোগের এক অব্যর্থ দাওয়াই দিয়েছিল। ইকবাল বলেছিল– আমার গ্রামে চল, ওই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বাপ্পাদিত্য ভরসা পায়নি। ইকবাল যে কোন সমস্যা সমাধানেই অতিরিক্ত তৎপর হয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলে। ওই সব প্রত্যন্ত গ্রামে আচমকা কোন হুজ্জোত হলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। বহুদিন গ্রামগ ঞ্জের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মত চকচকে আদ্যন্ত শহুরে বাবুদের যে গ্রামের লোক সব সময় ভাল চোখে দেখে, তাও নয়। ধীরে সুস্থে এগোবার মত সময় বাপ্পাদিত্যর হাতে ছিল না। তাছাড়া শরীরটাও তখনও পর্যন্ত এত খারাপ হয়নি। গত বছর সিঙ্গাপুরে গেল দল নিয়ে– তখনও তো ভালই ছিল। ইচ্ছে হলেও কোন নারীশরীর স্পর্শ করেনি। শুধু দর্শনেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছে। মনে মনে ভেবেছে মিথ্যেই এত সংযম। হয়তো রিপোর্টটাই ভুল। তবু প্রতিরোধ করেছে উদ্‌গত ইচ্ছে।

গেলাসটা হাতে নিয়েই অতিকষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠল বাপ্পাদিত্য। বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে তার? চামড়া খসখসে তেলহীন। খোঁচা খোঁচা দাড়ির আভাস মুখটাকে আরও কুৎসিত করে তুলেছে। চোখের নিচে কালি আর মাংসথলি। বাপ্পাদিত্য একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে হাতের গেলাস বেসিনে উপুড় করে দিল।

চান করে বেরিয়ে দামি জামা কাপড়ের মোড়কে চেহারাটা খানিকটা ভদ্রস্থ করে বেরোতেই আবার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ইকবালের সঙ্গে ঘেয়ো কুকুরের মত একটা লোক। তার একটা ক্যান্ডিডেট আছে। একবার দেখার আবেদন। বাপ্পাদিত্য মাছি তাড়ানোর মত করে তাড়িয়ে দিল লোকটাকে। ইকবালকেও ধমক দিল মৃদু করে এই সব উটকো ঝামেলা জোটানোর জন্য।

করিডোর দিয়ে হেঁটে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল নিচের হলে যাবার জন্য। লোকটাও পিছু পিছু এসেছে। এই সব দালালগুলো মাঝে মাঝে যে দুএকটা ভাল নমুনা আ নে না তা নয়। সস্তাও পড়ে। কিন্তু বেশির ভাগই রদ্দি মাল।

শরীরে দোলা লাগানো মিউজিকের সঙ্গে জোর নাচ হচ্ছে হলের মধ্যে। সবাই মহড়ায় ব্যস্ত। বাপ্পাদিত্য একটা সোফায় বসে চারদিকে লক্ষ্য করতে লাগল। জুনিয়র আর্টিস্টরা খাটো শর্টস আর হাতাকাটা গেঞ্জি পরে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রতিটি নাচেই তাদের কিছুটা অংশ আছে।

মেক্কআপ ছাড়া মেয়েগুলোকে ভালই দেখাচ্ছে। বেশ তাজা অনাঘ্রাতা কুসুমের মত। তুলনাটা মনে করে একটা তেতো হাসি হাসল বাপ্পাদিত্য। অনাঘ্রাতা কুসুম। মাই গড! প্রত্যেকটা মেয়ে বিষাক্ত। ওই ঝকঝকে চামড়ার নিচে থিকথিক করছে রোগ জীবাণু। কত বাপ্পাদিত্যকে মই করে বোকা বানিয়ে এতদূর এসেছে কে জানে।

মেয়েগুলো মিউজিকের তালে তালে সাপের মত দুলছে। চোখগুলো জ্বলছে পুঁতির মত। আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জেগে উঠছে বিষাক্ত নাগিনীর দল। পাতাল থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে– জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে বাপ্পাদিত্যদের। বিষাক্ত নিঃশ্বাসের হলকা এসে গায়ে লাগে। বাপ্পাদিত্যর দমবন্ধ হয়ে আসে। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

ঘরের বাইরে বোরোতেই দেখল সেই ঘেয়ো কুকুরের মত লোকটা লাউঞ্জে সোফায় বসে আছে– সঙ্গে সস্তা জরিদার শাড়ি পরা একজন বছর তিরিশ্বত্রিশের মেয়ে। এই নাকি ক্যান্ডিডেট? ঘেন্নায় বিরক্তিতে নাক কুঁচকে ওঠে বাপ্পাদিত্যর। একে তো নায়িকারা বাক্স বইতেও ডাকবে না। বাপ্পাদিত্য আর কোনদিকে না তাকিয়ে নোংরা নর্দমা পার হবার মত করে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল, লোকটা উঠে রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল– স্যার, অনেকদূর থেকে আসছি– একবার যদি দেখেন, একেবারে হিরোইনদের মত নাচবে– এই বলে একটা বাচ্চা মেয়েকে সামনে এগিয়ে দিল।

এদের দিকে তাকিয়েছিল বলে চোখেই পড়েনি, সঙ্গে একটা রোগা রোগা শালিকছানার মত ন্ননদশ বছ রের মেয়ে। মাথার চুল কানের তলা পর্যন্ত নেতিয়ে আছে। কপালের দু পাশে সাদা পাথর বসানো দুটো ক্লিপ শুধু বাড়তি চমক আনবার জন্য। পরনে সস্তা সার্টিনের ওপর জরির কাজ করা ঘাগরা চোলি। কাঁধের কাছে সেফটিপিন দিয়ে ব্লাউজটাকে রোগা শরীরের মাপসই করতে হয়েছে। মুখের পুরু পাউডারের প্রলেপে চোখের পাতা পর্যন্ত সাদা হয়ে আছে। ঠোঁটের লিপস্টিকের লাল রং দাঁতের গায়ে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ম্যাটিও যথাস স্তব সেজে এসেছে। মুখে বিনয়ের ঘামতেল। চোখে অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

বাপ্পাদিত্য মেয়েকে জরিপ করছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল– টানা দশখানা নাচ ও নাচতে পারে। ঐশ্বর্য রাই থেকে শুরন্ন করে করিনা কাপুর পর্যন্ত যার নাচই বলুন ও দেখিয়ে দেবে।

বাপ্পাদিত্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তার দুই কানই বধির। মাথার মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মত ছিটকে উঠেছে দৈববাণী, অক্ষতযোনি অনাঘ্রাতা কুমারী! একমাত্র স্লেই তোমার রোগজ্বালা উপশম করতে সক্ষম। তার পবিত্রতা দিয়ে সে রোগ নিজ অঙ্গে ধারণ করে রোগীকে রোগমুক্ত করে। এ নিশ্চয়ই দৈব প্রেরিত ওষধি। নয়তো বাপ্পাদিত্য সচেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকার তার করতলের মধ্যে চলে এল কী করে?

উপভোগে পরিপূর্ণ জীবনে প্রবলভাবে বর্তমান থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অতি বাস্তববাদী বাপ্পাদিত্য এতদিন যে সংশয়ে দুলছিল তা এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। এই তার জীবনদাত্রী প্রাণদায়িনী। পবিত্র ও কুমারী শরীরের পুষ্প ও চন্দনের গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। খানিক আগের বিষাক্ত সংস্পর্শের অসুস্থতা যেন পলকে অন্তর্হিত।

ছায়ার মত সদা বিশ্বস্ত ইকবালের দিকে তাকানোমাত্র সে বুঝে যায়। বলে, ডান্স মাস্টার ওপরে কামরায় আছে। একবার টেস্ট করে দেখতে পারেন।

বাপ্পাদিত্য পদমর্যাদার গুরুত্ব রক্ষা করে কোন কথা না বলে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। ইকবাল মা এবং মেয়েকে নিয়ে বাপ্পাদিত্যকে অনুসরণ করল।

মেয়েটি একহাতে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছিল। এই বৈভবসমা রোহপূর্ণ অজানা পরিবেশের অস্বস্তি আগে থেকেই তাকে ঘিরে রেখেছিল। এখন দুটো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একা চলে যাওয়ার অনিচ্ছা এবং শঙ্কা দুইই ফুটে উঠল তার চোখে। মা তাকে আশ্বাস দিতে দিতে দৈত্যাকৃতি লিফটটার সামনে নিয়ে এল। মেয়েকে ঠেলে দিল লিফটের মধ্যে। আঙুলের আলতো স্পর্শে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা।

তিন.

নীলা আনন্দে উদ্বেল হয়ে দেখল বৈদ্যুতিক পুষ্পক রথ বিদ্যুৎগতিতে পিংকিকে নিয়ে সোজা উঠে গেল স্বর্গের দিকে। মণ্টার বন্ধুকে ধরে এখানে পৌঁছবার জন্য যে মূল্য সে দিয়েছে, তার জন্য তার আর কোন আপসোস রইল না। দেবসভায় বেহুলার উত্তরসূরি নৃত্যরতা পিংকিকে কল্পনায় অনুভব করে তার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। লক্ষ্যভেদের সময়ে অর্জুনের দৃষ্টি যেমন শুধু বিহঙ্গ চক্ষুতেই আবদ্ধ ছিল, সেইরকম ওই একটিমাত্র দৃশ্য নীলার সমগ্র চেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। চারপাশের চোখ ঝলসানো বৈভব ও সমারোহ এতক্ষণ ধরে তার মনে যে মাদকতা সৃষ্টি করেছে তার অংশীদার হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার রক্তের মধ্যে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হাতের মুঠোয় আসা সাফল্য সামান্য বিচ্যুতিতে যেন ভ্রষ্ট না হয়– এই ভেবে নীলা উদ্বিগ্ন হয়। সে পিংকির সাফল্যের জন্য মনস্কামন্নাপূর্ণকারী পরিচিত কোন দেবতার কৃপাভিক্ষা করতে করতে এই উদ্বেগ্নউৎক ণ্ঠায় ভারাক্রান্ত অসহ্য মুহূর্তগুলো অতিক্রম করতে থাকে।

ঋতা বসু
ভারতের কথাসাহিত্যিক

নীলা আনন্দে উদ্বেল হয়ে দেখল বৈদ্যুতিক পুষ্পক রথ বিদ্যুৎগতিতে পিংকিকে নিয়ে সোজা উঠে গেল স্বর্গের দিকে। মণ্টার বন্ধুকে ধরে এখানে পৌঁছবার জন্য যে মূল্য সে দিয়েছে, তার জন্য তার আর কোন আপসোস রইল না। দেবসভায় বেহুলার উত্তরসূরি নৃত্যরতা পিংকিকে কল্পনায় অনুভব করে তার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। লক্ষ্যভেদের সময়ে অর্জুনের দৃষ্টি যেমন শুধু বিহঙ্গ চক্ষুতেই আবদ্ধ ছিল, সেইরকম ওই একটিমাত্র দৃশ্য নীলার সমগ্র চেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

সেই উঠোন

কাজী রোজী

উঠোনটাকে পেরিয়ে গিয়ে পথ
পথের শেষে অন্ধকারের রূপ
বৃক্ষরাজির গভীর ঘন ছুঁয়ে
তোমার আলো কালো কাটার পথ।

অন্য আদেশ অন্য সময় মেনে
রাত দুপুরে সুখের সীমা টানি
আনন্দে বেশ জড়িয়ে নেব নিজে
তোমার কোন ক্ষতির কারণ নয়।

শত্রু পাখি গাছের ডালে থাকে
তার নিধনে আমরা ডাকি তাকে
হায় না জেনে, আড়াল যারে করি
তার বাঁধনে নিজের ভাগ্য গড়ি।

আবার আসি সেই উঠোনে আমি
তোমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে থাকি
বৃক্ষরাজি গুল্মলতার মত
আলোর নাগাল হৃদয় ভরে রাখি।

লড়াই

জ্যোৎস্না লাহিড়ী

সব লড়াইয়েই যে জিততে হবে
এমন কোন কথা নেই।
তবু লড়াই থামে না।
লড়াই চলছে, চলবে, চলবেই।
রামায়ণ-মহাভরতের যুগের লড়াই
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াই
হিরোসিমা ধ্বংস সে-ও তো লড়াই
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি লড়াই নয়?
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় লড়াই চলছে
দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ তো এক রকম লড়াই
এ লড়াই কোনদিন থামবে না
অনাদি অনন্ত ধরে মানুষ যুদ্ধবাজ
মানুষের শরীরেও চলছে লড়াই

লড়াই এ্যান্টিজেনের সাথে অ্যান্টিবডির ॥

জ্যোৎস্না লাহিড়ী ভারতের কবি

অপূর্ব করএর ৩টি কবিতা

মুক্তাবাড়ি

কেউ কী বুঝতে পারে এ শহরে
প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে আছে একা সাগরবেলায়– বালুচরে
অনন্ত শব্দ-ঢেউ ধীরে ধীরে আগুয়ান হয়ে ছুঁয়ে যায় পায়ের পাতা

এক শব্দের উপর আরেক শব্দের জড়াজড়ি
অনেকেই হক্‌চক্, কাকে ভালবেসে, প্রিয় ভেবে প্রিয় পুরুষ, প্রিয় নারী
প্রিয় গান, মুক্তা করে ঝিনুক ভেঙে নিয়ে নেওয়া যায় মরমে করে বাড়ি
যা দিয়ে গড়ে ওঠে প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট পরিচিতি, গাঢ় নেমপেট

পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই বিশেষ শব্দে, আওয়াজে
সংবেদনশীল বা দুর্বল হওয়া ভাল, পিওন তো বটেই
যে কোন মনুষ্য অবয়বীর বেশি– কেউ সরাসরি বলে দিতে পারে
আমাদের কার কি ধরনের বাড়ি, এলেবেলে না মুক্তা-বাড়ি।

মনময়

মানুষ কিছু কিছু প্রেম রাখে পা-লিপিময়
কবে এক দোয়েল শিস দিয়েছিল, অদ্ভুত বৃষ্টি নেমেছিল মাঠময়
এক নারী কবিতায় কথা বলেছিল ঘন চোখে নীল খাম বিনিময়

সারাক্ষণ তারপর কারো কথা, সারা রাত তার কথা
যার মুখ পারিজাতময়
মাইল মাইল ব্যথা, অভিমান, কত স্বপ্ন নীল তবু সাগরে ঢেউময়

এই সব অমুদ্রিত অক্ষারের বর্ণমালা নিয়ে কত বই পৃথিবীতে
বকুলের ঘ্রাণ হয়ে বা শিউলির টুপটুপে ঝরে গেছে
কোন দিন কবিতার বই না হয়ে বাঙ্ময়

মৃত মুনিয়ার পালকের মত খোঁজ নিলে
পাওয়া যায় বুকে,– কিছু থাকে হয়তো বর্ণিল পালক ঘরময়।

বৃষ্টিমুখ

এত জ্বর, বিছানা বালিশ পুড়ে পুড়ে খরামাঠ

সেবাব্রতা হাত এসো, এসো বৃষ্টি, প্রিয় বৃষ্টি-মুখ

ঝরে ঝরে কাদা করো আমাকে– যাতে সারে চণ্ডাল অসুখ।

অপূর্ব কর ভারতের কবি

নারী

তিতুমীর ঋষভ

রহস্যময়তার অভিজ্ঞানে অভিযোজিত উৎসব যার
সে-ই নারী
পরিবীক্ষণ পাতার ভাঁজে ভাঁজে লিপিবদ্ধ
জীবনের নিরেট জাবেদা
সাবধানী, নির্ভুল সে
আবেগে আয়ত্তহীনা সে কি!
কামে ষোলকলা, ক্রোধে ঝাল মেকি

প্রেম ও অপ্রেম

সমীর চট্টোপাধ্যায়

মনে হয় শুয়ে আছি কোন এক অন্ধকার ঘরে,
দেওয়ালের ফাটলে মাকড়সারা জাল বুনে চলে,
এখন মানুষেরা শান্তি হারিয়েছে সময়ের দোষে,
বেঁচে থাকার শিষ্টতায় মেনে সব কিছু আপসে।

এখনও এখানে আজো দানবেরা ঘোরে রক্তের অভিযানে,
বুদ্ধের উপদেশ এখন শিয়ালে চেটে খায়–
অস্থির হাওয়া এসে ইটের ভিতর ফাটল ধরায়।

ধর্মের ষাঁড়েরা সব নড়ে চড়ে ঘোরে।
ভারত সাগরের তীরে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে
কত জননীর মৃত্যু হল উপেক্ষায় উপবাসে;
নিজের সন্তান তারা তবু নবীর আনন্দে তারা হাসে
সূর্যের সোনালি রোদ মেখে বোলতার হুল ফোটায় ত্রাসে।
এখন এদেশ মরুময়, প্রেম গেছে বালির ভিতরে,
সভ্যতার তামাসা নত শিরে মেনে নেয় চুপে।
তবু কিছুক্ষণ এই মাটির আড়ম্বর অনুভব করে বৃদ্ধ দম্পতি
চোখে তাদের তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা– এ মাটি নদী হবে কবে?
হয়তো-বা তারা ভেবেছিল আদিম পৃথিবী চায়
আদিমতা ফিরে আসুক বারে বারে
যে বাতাস খেলা করে অরণ্যের ঘরে।

আজ যারা মানবিক ভিতগুলো ভেঙে দেয় বারে বারে
হয়তো প্রজ্ঞা পারমিতারা মূঢ়ধী শম্বর
প্রতিভার আস্ফালনে বার বার ভুল করে, বধ করে প্রেম।

সেই সব ভ্রূণ আজও আছে মাটির গভীরে
যারা জানে প্রেম কাকে বলে
সেইসব আদি ও অকৃত্রিম প্রেম
আজও আছে সুন্দর প্রেমিকের খোঁজে ॥

সমীর চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

মৃত বৃক্ষের বন

ওয়ালী কিরণ

আকাশের উজ্জ্বলতার নিচে মৃত বৃক্ষের বন
মড়কে মৃত ছেচলিশটি পুরাতন শিশু গাছ,
একটি কালের মৃত্যু,ঘোষণা করেছে।
আকাশ বাতাস আর তারকার দিকে লক্ষ্য রাখা
এক মানমন্দির, এক কর্মমুখর পরিবেশ পরিদপ্তর তার
কার্যালয় গুটিয়ে ফেলেছে।
এখন কেবলই কাষ্ঠ কর্তনের অপেক্ষায়।
পাতাহীন ছাল-বাকলবিহীন প্রেতের মতন খাড়া।
গাছ কাটা হবে, তার সম্পন্ন হয়েছে প্রস্তুতি।
মৃত গাছ কর্তনে বিবেকের দংশনও নেই।
কেন-না জীবিতদের সাথে মৃতদের
পাশাপাশি বসবাস নিষিদ্ধ।

ছেচলিশটি শিশুগাছ আকাশের দিকে উদ্বাহু।
যেন উর্ধ্বপানে চেয়ে ভয় আর আতঙ্কে প্রার্থনারত অবস্থায়
জীবাণু অস্ত্রের দ্বারা তারা সব একত্রে নিহত।

তোমার স্পর্শ

অমিতাভ চক্রবর্তী

তোমার নিবিড় স্পর্শ আমাকে তাপিত করে
ভাবিত করে বেঁচে থাকার সুখ-সমুদ্র
কত গভীর? কত গভীর আকাশের শূন্যতা?
এ-সব তত্ত্বকথা তোমাকে শোনাতে চাই না আর!

বাস্তবতার কঠিন মাটিতে আমাদের পদক্ষেপ,
চাওয়ার চেয়ে পাওয়া যখন অনেক বেশি,
তখন প্রয়োজন নেই মিথ্যা শব্দ-সাজাবার।

তোমার চুম্বন-সুধার স্বাদ আজো লেগে আছে
আমার জিভে, ঠোঁটে, প্রতিটি শিরার স্পন্দনে;
নন্দনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তুমি-ই সেই অপ্সরা,
উর্বশী কিন্নর-উপত্যকার নিরন্নত্তর প্রিয়তমা!

কি চেয়েছি, কি পেয়েছি, প্রয়োজন নেই আর
কাটাকুটি খেলার, তোমার সর্পিল স্পর্শ আজ
আমাদের দগ্ধ করুক কামনা-বাসনার প্রজ্জ্বলিত চিতায়;
তোমার অস্তিত্ব আমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করুক অবিরত!!

অমিতাভ চক্রবর্তী ভারতের কবি

নিবন্ধ

রঙ যেখানে নিত্যসঙ্গী

সৈয়দ লুৎফুল হক

রঙের মূল সূত্র হল আলোর প্রতিফলন। যেখানে আলো নেই, সেখানে রঙও নেই। ইংরেজিতে বলা হয়, Colour is reflection of light। রঙের প্রতি মানুষের অনুসন্ধিৎসা জন্মগতভাবে। যেমন একটি শিশু রঙের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। আজ থেকে আনুমানিক বিশ হাজার বছর আগে মানুষ রঙের ব্যবহার করেছে। আকাশের রঙধনুর রঙ প্রাচীন যুগের মানুষের কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। সম্ভবত রঙধনুর রঙ, প্রকৃতিতে সৃষ্ট ফুল, ফল, পাখি, জলজপ্রাণী, এমনকি পশুর রঙ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষ পশু শিকার করে খেত। রঙ দিয়ে তারা এসব পশুর ছবি কিংবা শিকারের ছবি পাথরের গায়ে আঁকত। স্পেনের আলতামিরা এবং ফ্রান্সের লাসকো গুহাচিত্র তার প্রমাণ। পাথর কিংবা খড়িমাটির রঙ দিয়ে এগুলো আঁকা হয়েছে। রঙ মানুষের আনন্দ-বেদনা এবং জীবনাচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঙ শিল্প-সাহিত্য, প্রেম-বিচ্ছেদ, আনন্দ-উল্লাস এমনকি বার্ধক্য ও যৌবনের নিত্যসঙ্গী। চিত্রকলা, নৃত্য, ভাস্কর্য, গান ও কবিতায় রঙের উপস্থিতি অনিবার্য। আমাদের দৃশ্যমান ভুবনে যেমন আকাশ মৃত্তিকা জল– সর্বত্রই রঙের সমারোহ। সাহিত্য ও কবিতায় রঙের ব্যবহারে কোন ঘাটতি নেই– যেমন কবির ভাষায় 'নানা রঙের দিনগুলি', 'ও শিমুল বন দাও রাঙিয়ে মন', 'লাল টুকটুকে বউ যায় গো লাল নটের খেতে'। কালিদাসের শকুন্তলায় দেখি, রাজা দুষ্মন্ত বোধিদ্রুমের ওপর তৈলমিশ্রিত রঙে ছবি এঁকে শকুন্তলাকে উপহার দিচ্ছেন। এমনিভাবে, পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে রঙ সম্পর্কে নানা বর্ণনা এসেছে।

ইউরোপে নবজাগরণের পর শিল্পীরা বিভিন্ন রঙ তৈরি করতে নানারকম গবেষণা করেছেন। প্রথমেই মনে আসে শিল্পী মানের কথা। মানের কিছুকাল পর জর্জ স্যুরা এবিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৮৪ থেকে '৮৬– লন্ডনের একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ পড়ার সময় তিনি রঙের প্রকৃতিগত রূপ এবং এর বিশেষত্ব সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। তখন Lapiz Lazuli নামের মূল্যবান পাথরের তৈরি রঙের ব্যবহার হত, যার নাম ছিল 'আলট্রামেরিন'।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হোলি উৎসব রঙেরই উৎসব যেখানে রঙ ছিটিয়ে, গায়ে রঙ মেখে পরস্পরকে রাঙিয়ে তোলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মে রঙ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন কোন আচার-অনুষ্ঠান নেই যেখানে রঙের প্রয়োজন নেই– বিবাহ উৎসব থেকে শুরু করে প্রতিটি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে রঙের ব্যবহার রয়েছে।

স্যুরা নতুন রঙের পিগমেন্ট তৈরি করেন, যা কম খরচে চিত্রাংকনে সহায়ক। শিল্পীর স্টুডিওতে নান্দনিক মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রঙ ব্যবহারের মাধ্যমে চিত্রকলায় শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটানো হয়ে থাকে। যেমন কোন বস্তুর রঙ, আকার, উদ্দেশ্য, চিন্তা প্রভৃতি রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। রঙ কোন বস্তুর নান্দনিকতা, কার্যকারিতা ও গুণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে না।

রঙ মানুষের মনে প্রভাব ফেলে এটি ইউরোপে প্রথম লক্ষ্য করেন গ্যাটে। নির্মাণগত পরিসরের নীতিমালায় রঙ ছন্দোস্পন্দ শীর্ষস্থানীয় গড়নগত বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কোন ইমারত গড়নগত নীতি অনুসরণ করে নির্মিত হয়। কোন কারখানা কিংবা বিশ্রামাগার আলোকসজ্জা ও রঙের নান্দনিকবৈশিষ্ট্যে সাজানো হয়ে থাকে। যেমন কর্মচঞ্চল দোকান বা মেঝেতে কড়া লাল রঙ ব্যবহার না করে কমলা, হালকা নীল রঙ ব্যবহার করা উচিত। কমলা, লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি উষ্ণ রঙ মানুষের মন ও শরীর সুস্থ রাখে।

শৈশব-যৌবনের আনন্দউল্লাস, ভালবাসায় রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। রঙ মনকে সতেজ করে, দেহকে কর্মোদ্দীপ্ত করে। যে কোন বস্তুর রঙ মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। যেমন নীল রঙ মানুষকে বিচলিত করে, সবুজ রঙ মনের উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করে। উড়োজাহাজের ভেতরের রঙ স্ফূর্তিময় হলুদ করা হলে করিডোরের যন্ত্রউপকরণ বিকল হতে পারে, বিবমিষার সৃষ্টি করতে পারে। কর্মব্যস্ত দোকানের মেঝেতে লাল, কমলা কিংবা কোন উষ্ণ রঙ ব্যবহার না করাই ভাল, তাতে চোখে পীড়া অনুভূত হয়। হালকা রঙ ব্যবহারে মানসিক সুস্থতা ও কাজের আগ্রহ তৈরি হয়।

চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গ– রূপভেদ, প্রমাণ, পরিমাণ, ভারসাম্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*তে চিত্রের ষড়ঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যে শাস্ত্রীয় চিত্রাঙ্কন যেমন দৃশ্যশিল্পকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল: এক. লাইন, দুই. ভ্যালু (আলোছায়ার স ম্পর্ক), তিন. কালার (রঙ), চার. টেক্সচার, পাঁচ. ভলিউম (দৈর্ঘ্যপ্রস্থ-উচ্চতা), ছয়. পারস্পেকটিভ (দূরত্বের কৌণিক অবস্থান) অর্থাৎ নির্দিষ্ট দৃশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত দৃশ্যমান বস্তু।

সংগীতে যেমন সাতটি মূল সুর আছে, চিত্রকলার তেমনি সাতটি রঙ আছে। সাত রঙের সারসংক্ষেপকে বলা হয় VIBGYOR অর্থাৎ Violet (বেগুনি), Indigo (ঘননীল), Blue (নীল), Green (সবুজ), Yellow (হলুদ), Orange (কমলা) এবং Red (লাল)। মূল শুদ্ধ রঙ তিনটি– লোহিত, হরিৎ ও নীল। লোহিত ও হলুদের মিশ্রণে কমলা, হলুদ ও নীলের মিশ্রণে সবুজ এবং নীল ও লোহিতের মিশ্রণে বেগুনী রঙ সৃষ্টি হয়। ভরত যেমন কোন্ রসে কোন্ সুর ব্যবহৃত হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি কোন্ কোন্ রসের অভিব্যক্তিতে কোন্ কোন্ রঙ ব্যবহৃত হবে, তারও নির্দেশ দিয়েছেন।

বাইরের রঙের উপকরণ এবং চিত্তের ভাব– এই দুইয়ের মিলনে রসোত্তীর্ণতার সার্থকতা নির্ভর করে। শিল্পের রূপ যখন রসিকচিত্তকে রাঙিয়ে তোলে, তখনই শিল্প সৃষ্টি হয়। কান্তিলাল পা- শিল্পকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন, যেমন– রসব্রহ্মবাদ (কবিতা ও সাহিত্য), নাদব্রহ্মবাদ (সংগীত বা যন্ত্রসংগীত), বস্তুব্রহ্মবাদ (চিত্রকলা, স্থাপত্য, নৃত্যকলা)। সব মিলিয়ে তিনি শিল্পকলাকে ব্রহ্মবাদ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

বর্ণিকাভঙ্গের রহস্যোন্মোচনের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বেতাশ্বর উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– 'যা একোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ বর্ণান অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।' বর্ণিকাভঙ্গ রঙ্গলীলায় ভরতমুনি কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙ মেশালে কি রূপ ধারণ করে তার উপমা দিয়েছেন–

"শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ, সিতে হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ
কপোতঃ করুনশ্চৈব, রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবদ্ভুতঃ স্মৃতঃ ॥

জল, আকাশ, বাতাস, এদের কোন রঙ নেই, অথচ এরা বহু বিচিত্র রঙের স্রষ্টা ও ধারক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোর খেলা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে রঙের মিশ্রণ ঘটায়। কবির গানেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।'

কবির কবিতায়, সাহিত্যে, বিভিন্ন উপমায় রঙ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে– চিত্রকলায় তো আছেই। রঙ মানুষের ব্যবহারসামগ্রীর অন্যতম বস্তু যার মধ্যে হাসি, কান্না, শোক, ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মীয় আচারঅনু ষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক উৎসবে রঙের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রঙ আমাদের চলার পথের সঙ্গী– রঙ ছাড়া সবই অন্ধকার।

ধর্মীয় আচারঅনু ষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হোলি রঙেরই উৎসব– যেখানে রঙ ছিটিয়ে, গায়ে রঙ মেখে পরস্পরকে রাঙিয়ে তোলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মে রঙ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন কোন আচারঅনু ষ্ঠান নেই যেখানে রঙের প্রয়োজন নেই– বিবাহ উৎসব থেকে শুরু করে প্রতিটি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে রঙের ব্যবহার রয়েছে। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমানের পারিবারিক অনুষ্ঠানে রঙ দিয়ে ঘর সাজানো, বরক নেকে মেহেদির রঙ দিয়ে সাজানোর প্রচলন রয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জাতিউপজাতি গা য়ে রঙ মেখে তাদের গোত্রের পরিচিতি প্রকাশ করে থাকে। পাপুয়া-নিউগিনির সলমন দ্বীপের বাসিন্দারা গায়ে রঙ মেখে সেজে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নানা রঙে নৌকা সাজিয়ে তারা নৌকা বাইচ করে থাকে। আমাদের দেশেও রঙ দিয়ে এধর নের নৌকা, ঘট, মাটির কলস কিংবা সখের সরা সাজানোর প্রচলন রয়েছে। রঙ-বেরঙের পোশাক পরিধান আমাদের আচারগত বৈশিষ্ট্য। আফ্রিকার অনেক উপজাতি আছে যাদের কেউ মারা গেলে তার কফিন সুন্দর করে রঙ দিয়ে সাজিয়ে দেয়। যেমন কেউ জুতোর ব্যবসা বা জুতো তৈরির কাজ করত– তাঁর কফিনটি জুতোর আকৃতিতে তৈরি করা হয়; মোটর চালকের কফিনটি গাড়ির আকৃতিতে তৈরি করা হয়– তাতে লোকটি জীবদ্দশায় কি কাজ করত, তা সহজেই বোঝা যায়।

সুখদুঃখ, প্রেম-বেদনা, জীবন-যৌবন, এমন কি মৃত্যুর পরও রঙ নানাভাবে আমাদের কাজে লাগে। সমুদ্রের জলরাশি, জলজপ্রাণি, এমনকি মাছের গায়েও রঙের অপূর্ব সমারোহ। বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে রঙ একটি অপরিহার্য বিষয়। আলোকরশ্মির মাধ্যমে আমরা রঙ্গীন ছবি দেখতে পাই, যেমন টেলিভিশন ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে লাল, নীল, সবুজ (যাকে আমরা ট্রিনিট্রন বলি)এর মাধ্যমে কয়েক লক্ষ রঙ দৃশ্যগোচর হয়। ছাপার কাজে ইয়োলো (হলুদ), মেজেন্টা (গাঢ় লাল) ও সায়েন (নীল)– এই তিনটি রঙ থেকে কয়েক লক্ষ রঙের সৃষ্টি করা যায়।

মানুষ রঙের সমুদ্রে ডুবে আছে। রঙের ভেতরে তারা বেঁচে থাকবে কোটি কোটি বছর। বিশ্বের বিস্ময় এই বর্ণবিভা মানবজাতির কল্যাণে বারবার ফিরে আসবে। মানুষের কল্যাণে রঙ চিরদিন বেঁচে থাকবে।

সৈয়দ লুৎফুল হক
চিত্রকর, প্রাবন্ধিক

প্রশিক্ষণ

উড়িষ্যার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট

মো. ছাকী হোসেন

শেখার শেষ নেই। সেটা হতে পারে পাঠ্য বই থেকে, পারে প্রশিক্ষণ থেকে। স্লেরকম একটা অনুভূতি নিয়েই আমার ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া নিজের কেরিয়ার উন্নয়নের জন্য। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে আমার কর্মস্থল বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)এর একজন সহকর্মী জানালেন আমার নাম ভারতে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মনোনীত হয়েছে। খুশি হলাম এই ভেবে যে, পূর্ব্বপুর ষের দেশ ভারতে সরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া গেল। বলে রাখা ভাল, আমার পূর্ব্বপুর ষের নিবাস অসমের করিমগঞ্জ জেলায়। ১৯৪৭এ দেশবিভাগের আগে সিলেট জেলাও ছিল অসমের অন্তর্গত ছিল। ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপা রেশন (আইটিইসি)র দেওয়া ভারতীয় বৃত্তির অন্তর্গত এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির নাম 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন'। উড়িষ্যার রাউরকেল্লার কানসবাহালে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইপিএম)এ ৭৫ দি নের একটি কোর্স। সেখানে অন্যান্য দেশের প্রশিক্ষণার্থীরাও থাকবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও এমবিএ ডিগ্রি থাকায় যোগাযোগ বা খাপ খাইয়ে

নিতে অসুবিধা হবে না ভেবে আত্মবিশ্বাসী হলাম। ভারতের বিদেশমন্ত্রক ও ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় যোগাযোগ করে ২০০৬এর ১ জানুয়ারি ঢাকা গেলাম। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি্ তে গেলাম শিল্প মন্ত্রণালয়ের চিঠি নিয়ে। ২/৩ দিনের মধ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হবে, তাই শারীরিক, মানসিক, আর্থিক চাপ ছিলই। অবশেষে, ৬ জানুয়ারি আমার কর্মস্থল টিএসপি কমপ্লেক্স লি. থেকে ঢাকা হয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্এ কলকাতা পৌঁছলাম। আইআইপিএম্এর প্রতিনিধি শ্রী কে ভি ম্যাথিউ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে হাওড়া স্টেশন থেকে রাত সাড়ে ন'টায় করোপুট এক্সপ্রেস ট্রেনে তুলে দিলেন। হাওড়া পৃথিবীর ব্যস্ততম রেল স্টেশনের একটি। এত বড় এবং জনাকীর্ণ স্টেশন আমি জীবনে দেখিনি। কোল্ড এলার্জি থাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাতে কষ্টই হচ্ছিল। ক্লান্ত থাকায় অন্য কারো সঙ্গে কথা বলিনি। ৭ জানুয়ারি ভোরে ট্রেন রাউরকেল্লা পৌঁছাল। তীব্র শীতে হাত মাথা কান– সবই ঠাণ্ডা। থ্রি হুইলারের দু'পাশ খোলা। মনে হয় ৪/৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা। সূর্যোদয়ের পথে সকাল সাতটায় ঘন কুয়াশার মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেই স্বপ্নের আইআইপিএম্এ। বাঈ না মে একজন কেয়ার্ টেকার আমাকে স্বাগত জানালেন। ঐ কোর্সে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে আমার আগমন সবার আগে। পরিচয় পাওয়ার পর বাঈ ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। বেশ মজাই পেলাম। ঘণ্টাদুয়েক কম্বলের ভেতর বিশ্রাম নিলাম একটি কক্ষে। তারপর আমাকে নেওয়া হল ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে। এমন একটি কক্ষে আমাকে রাখা হল সেখানে পাশেই একজন মুসলিম প্রকর্মীর বাসা। আলম নামে ঐ প্রকর্মীর বাড়ি বিহারে, এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে বসবাস। দিনটি শুক্রবার থাকায় আলম সাহেব আমাকে নিয়ে পাশের বাজারে একটি জুমা মসজিদে নামাজ পড়তে নিয়ে গেলেন। আমি খুশি হলাম। মসজিদেই পরিচয় হল আরও ৩ বাংলাদেশীর সঙ্গে যাদের বাড়ি ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। ওরা ওখানেই সেটেল্ড। ওরা দেশের খোঁজখবর নিলেন। আমাকে দেখে খুশি হলেন। ওই এলাকায় রিক্সা নেই। সবই বাইসাই কেল। মধ্যবিত্তের বাহন গাড়ি।

৮ জানুয়ারি আমার প্রশিক্ষণ পরিচালক আর এন পালের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁকে চামড়ার তৈরি একটি স্লিপ বক্স ও একটি ভিজিটিং কার্ড হোল্ডার উপহার দিলাম। তিনি সানন্দে গ্রহণ করে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিলেন। জানা গেল, তিনিও কলকাতার লোক। ঐ দিন বিকেলেই এয়ারটেল ব্রান্ডের মোবাইল ফোন সিম কিনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। ভারী আনন্দ পেলাম। আইআইপিএম্এর পরিবেশ দেখে আমি অভিভূত– চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গাছপালা ও সবুজের সমারোহে মন ভরে যায়। কিন্তু রাতে ঘন কুয়াশা আর ঠাণ্ডা। ৯ জানুয়ারি শ্রী পাল আমাকে একটা ডায়েরি উপহার দিলেন। অন্যান্য বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী তখনও এসে পৌঁছেননি। ওই দিন অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় সেরে নিলাম। আমার পূর্বপুরুষ ভারতের জেনে সবাই খুশি হলেন। ১১ জানুয়ারি ঈদ উল আযহা। প্রস্তুতি নিয়ে আইআইপিএম্এর নিকটবর্তী বিলাইগড় মসজিদে প্রায় আড়াইশো মুসল্লির সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে কোথাও যাওয়া হল না। কাউকে চিনি না। আলম সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হলেও ঐ দিন কেউই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। আপ্যায়ন ব্যবস্থা ছিল শূন্য। ইতোমধ্যে এয়ারটেল নাম্বার সবাইকে জানানোয় বাংলাদেশ থেকে অনেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন। বিকেলে ঢাকার বিক্রমপুর ও মুন্সীগঞ্জের কতিপয় বাংলাদেশীর সঙ্গে ঈদের কুশল বিনিময় করলাম। একসঙ্গে চানা স্তা খেলাম। এরমধ্যে অন্যান্য দেশের প্রশিক্ষণার্থীরা এসে পৌঁছলেন। কয়েকজন অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মিশর, ফিজি, নেপাল, মরিশাস, থাইল্যান্ড ও তুরস্কের কর্মজীবীরা এসেছেন প্রশিক্ষণ নিতে। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সব মানুষ– সাদা, কালো, শ্যামলা। সবার ভাষা আপাতত ইংরেজি। ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধনী ক্লাস নিলেন প্রবীণ শিক্ষক মি. এ জয়প্রকাশ– বিদেশীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বলে বেশ উৎফুল্ল।

রাতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কোর্সে আসা কতিপয় ছাত্রের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেললাম। পরিচয় হল, আড্ডা জমল। এরই মধ্যে আইআইপিএম ক্যাম্পাস থেকে ১৭১৫ কিমি দূরে গোল্ডি গার্ডেন নামে একটি স্পটে আইআইপিএম্এর পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হল। চমৎকার ব্যবস্থাপনা। ঘোরাফেরা, আনন্দফুর্তি, নাচগানে ভরপুর একটি দিন। কি একটা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি প্লেটে খাবার খেলাম। সেই ছোটবেলায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অসমে পাতার বিড়ি খেয়েছিলাম আর পৌঢ় বয়সে সেই ভারতেই খেলাম পাতার থালায় ভাত।

ক্লাস যথারীতি চলছিল। এর ফাঁকে উড়িষ্যার সমাজধর্মশিক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে অফিসের অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ছাড় নয়। উড়িষ্যা তুলনামূলকভাবে গরীব রাজ্য হলেও সবাই কাজেক র্মে তৎপর। নিষ্ঠায় কোন ঘাটতি নেই। সবাই যেন অল্পে সন্তুষ্ট– এমন একটা মানসিকতা কাজ করে। দিনে ও রাতে আন্তর্জাতিক অংশ গ্রহণকারীদের জন্য খাবারের মেনু আলাদা। ভাত, চাপাতি, সবজি, মাংস, বিভিন্ন স্বাদের তরকারি– সঙ্গে দই, মিষ্টি, কলা, আপেল, পেঁপে ইত্যাদি যে কোন একটি ডেজার্ট। বিকেলে হালকা নাস্তা ও চায়ের ব্যবস্থা। আমার সঙ্গে কয়েকজন মিশরীয় মুসলিম থাকায় কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য হালাল মংসের ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতের মাছ ছাড়াও মুরগির মাংস থাকত। ওরা প্রথম প্রথম মাংস একেবারেই খেত না। পরে হোস্টেল সুপার আমাকে দিয়ে মোরগ জবাই

করাতেন। মাঝে মাঝে দুপুরের খাবারের আয়োজনে ক্লাসের ফাঁকে আমাকে ডেকে এনে জবাই করাতেন। এতেই তারা মনভরে মুরগির মাংস খেতে পারত। তুরস্ক ও মিশরের চারপাঁচজন ব ন্ধু আমাকে অনুসরণ করে ক্লাসের ফাঁকে নামাজের সময় হলে একসঙ্গে নামাজ আদায় করতাম।

প্রতিদিন বাংলাদেশে মোবাইল ফোনে কথা, ই মেইল ইত্যাদি কারণে আমি খুব আনন্দেই থাকতাম। বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রত্বের কারণে খাওয়াদাওয়ায় নিরাপ ত্তা ছিল আলাদা। এরই মধ্যে জোরেশোরে ক্লাস আরম্ভ হল। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বিষয়ভিত্তিক শ্রীকান্ত পাণ্ডা, আর এন পাল, অনিমেষ রায়, রাকেশরঞ্জন, এম আর নায়েক, শ্রী ত্রিপাঠী, অজয়কুমার এবং জি সি মহাপাত্র। আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় ছিল পাঠ্যসূচির অংশ। পুরো দলে আমিই একমাত্র ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা। তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরে। দেবাশিস দেব নামে কলকাতার একজন ছাত্রের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে টিপিএম অর্থাৎ টোটাল প্রোডাকটিভিটি ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি আমাকে দারুনভাবে উপকৃত করেছে। নতুন ও জ্ঞানগর্ভ সব বিষয়– খুবই আকর্ষণীয়। আইআইপিএম প্রতিষ্ঠানটি চলে টিপিএম পদ্ধতিতে। পুরো পদ্ধতিটাই কম্পিউটারাইজড্।

যাহোক, আইআইপিএমএ পৌঁছে প্রথম যে স্মরণীয় ও বরণীয় দিনটি সামনে পেলাম, সেটি ভারতের 'প্রজাতন্ত্র দিবস'। ঐ দিন ভারতীয় সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আমরা বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করলাম। বিদেশীদের পক্ষে আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হল। ইংরেজিতে দেওয়া বক্তব্যে ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক সাহায্যসমর্থ নের জন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ ও আনুগত্যপূর্ণ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। বিপুল করতালির মাধ্যমে আমার বক্তব্যকে স্বাগত জানানো হল।

২ ফেব্রুয়ারি আইআইপিএমক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল সরস্বতী পূজা যেখানে আমাদের পদচারণা ছিল সরব। জীবনে প্রথম এমন একটি

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের যে আদরআপ্যায়ন করা হল তাতে মনটা ভরে গেল।

২৪ ফেব্রুয়ারি আমরা রাউরকেল্লা ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ (আরআইএমএস)এ অনুষ্ঠিত 'কর্পোরেট রিইনকার নেশন: রিচিং নিউ হরাইজন' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে দেখা হল এক বিশেষ বক্তিত্ব *ইন্টেলেক্টবিজ লি.*র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. মঈদ সিদ্দিকীর সঙ্গে। একইভাবে আমরা আইআইপিএমএ 'প্রজ্ঞান'এর একটি জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করলাম। আলোচনার বিষয় ছিল 'ব্লেন্ডিং অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফর ম্যানেজারস অফ টুডে এন্ড টুমরো'। আমাদের সুযোগ করে দেওয়া হল 'প্রজ্ঞানে' প্রবন্ধ উপস্থাপনের।

নেপালের ব্রীজেশ শর্মা ও আমি পৃথক পৃথকভাবে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পেপার উপস্থাপন করলাম। টেকনিক্যাল সেশনের চেয়ারপারসন ছিলেন ভুবনেশ্বরের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পি কে মিশ্র। তিনি ছিলেন রোমান্টিক ও খোলামনের মানুষ। আমার বক্তব্যের পর মন্তব্য করলেন 'ইমোশনাল স্পিচ ফ্রম বাংলাদেশী ফ্রেন্ড'। তিনি হিন্দিতে কিছু কথা দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিলেন। পরে জানলাম তিনি বলেছেন, 'যে আনন্দ দিতে জানে সে সবখানেই আনন্দ দেয়, যা মি. ছাকী আমাদের দিয়েছেন'। আমার উপস্থাপনায় আইআইপিএমএর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী খুশি হলেন। জাতীয় সেমিনার হলেও বিদেশীদের অংশগ্রহণে তা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল। এমডিআইএর সাবেক পরিচালক ড. জে প্রসাদ আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ববোধ করলাম। পুরস্কার হিসাবে আমাকে দেওয়া হল সনদসহ বাবা গণেশএর একটি মূর্তি। পুরস্কারটি পরে আমি বিসিআইসির পরিচালক (বাণিজ্যিক) দীপককুমার দত্তকে উপহার দিয়েছিলাম।

জাতীয় সেমিনারের পর কর্তৃপক্ষ আমাদের ছুটি দিলেন। ছুটিতে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলে গেলাম আগ্রায় তাজমহল দর্শনে– ভারতে এসে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি দেখব না, তা হয় না। তাজমহল ছাড়াও ফতেপুর সিক্রি, আকবর মসজিদ, সেলিম চিশতির মাজার, আগ্রা ফোর্ট, দিল্লি জামে মসজিদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান দেখে মন ভরে গেল। কলিঙ্গ উৎকল এক্সপ্রেসযোগে আবার কানসবাহাল ফিরলাম যথাসময়ে। ৯ মার্চ স্টাডি ট্যুরে আমাদের নেওয়া হল উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে। সরকারি বিশ্রামাগার 'পান্থশালা'য় গিয়ে উঠলাম। সেখানে আমরা খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, এলিফ্যান্ট কেইভ ঘুরে দেখলাম– খুব ভাল লাগল। এত বানর জীবনে কোনদিন একসঙ্গে দেখিনি। শিব ও বুদ্ধ মন্দির দেখলাম ধবলগিরিতে। নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন জাতের পশুপাখি দেখলাম। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল সাদা বাঘ দেখে। পরের দিন কোনার্কের সূর্য মন্দির দেখে পুরীর সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলাম। সৈকতের বালির দানা আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দানার চেয়ে বেশ বড় বলে মনে হল। পানির লবণাক্ততাও যেন বেশি। তবে ভারী সুন্দর সৈকত। কাছেই চন্দ্রা হাট, পুরী মেইন মার্কেট ঘুরলাম। সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনলাম স্মৃতি হিসাবে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনালয় জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শন শেষে পিপিলি এলাকা থেকে ভেনেটি ব্যাগ, ওয়ালেট কিনে গেস্ট হাউজে ফিরলাম। পরের দিন উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. পি কে মিশ্রর সঙ্গে দেখা করলাম। ড. মিশ্র আইআইপিএম্এর সেমিনারের চেয়ারপারসন ছিলেন। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এডভান্সড্ স্টাডিজ অন সাইকোলজি: কানাডিয়ান এন্ড ইন্ডিয়ান পারস্পেকটিভ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমরা সবাই উপভোগ করলাম। বিকেলে রাজ্য যাদুঘরে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখলাম। আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্রে দেখলাম আধুনিক সব উপকরণ ও কৌশল।

রাউরকেল্লাকে 'স্টিল সিটি' বলা হয়। স্টিল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া লি.এর আওতাধীন লার সেন এন্ড টুব্রো (এল এন্ড টি) একটি বিখ্যাত কারখানা। প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে আমরা কারখানাটি পরিদর্শন করেছি– ভারী যন্ত্রপাতি, পে লোডার, গাড়ির চাকা প্রভৃতি তৈরি হতে দেখে আমরা অভিভুত।

এল এন্ড টির নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুবই শক্তিশালী। আইআইপিএম্এর কাছে রাজগাংপুরে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড্ উড়িষ্যা সিমেন্ট কোম্পানি পরিদর্শন করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। এখানে মাত্র একশো জনবল নিয়ে প্রতিদিন পাঁচ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্সের ফাঁকে যেসব কাজ করে আমি আনন্দ পেয়েছি সেগুলো হল– *সাইফিডটকম্*এ ই মেইল খুলে সবার সঙ্গে যোগাযোগ, বিশ্ব ভালবাসা দিবস উপলক্ষে মুম্বই থেকে ভিপিপি যোগে 'আই লাভ ইউ' লেখা লকেট এনে স্ত্রীর কাছে পাঠানো, *থিংকইনক* দিল্লি থেকে ভাল ভাল বই কেনা, বিলাইগড়, রাজগাংপুর, রাউরকেল্লার বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন, কানসবাহাল রেল স্টেশন, জগন্নাথ মন্দির, মাউন্ট কোর্ট স্কুল ও বিভিন্ন বাজার ঘোরা। সবই সম্ভব হয়েছে আইআইপিএম কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে। মন্দির পরিদর্শন করে যে বিষয়টি শিখেছি তা হল– গড স্ট্যান্ডস্ ফর জেনারেটর, অপারেটর এন্ড ডেস্ট্রাকটর। তাই আজও সেই প্রশিক্ষণের স্মৃতি ভুলতে পারিনি। বারবার মন চায় আবার দেখে আসতে। কিন্তু আইআইপিএম কলকাতা ও ভুবনেশ্বরের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় যাতায়াত কষ্টকর মনে হয়। আকাশপথে সরাসরি যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

উড়িষ্যা ভ্রমণের আগে ও পরে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকে যে আন্তরিক ও ত্বরিৎ সহায়তা পেয়েছি তা ভুলবার নয়। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আইআইপিএম্এ প্রশিক্ষণকালীন যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাছে সার্বিক সহায়তা পেয়েছি তাদের মধ্যে এস ঘোষ মজুমদার, বি কে সাহানী, এ বসু মজুমদার অন্যতম। গাড়িচালক মানুর কথা না বললেই নয়, তিনি প্রায়ই আমাকে মসজিদে যেতে সাহায্য করতেন।

মো. ছাকী হোসেন
আইআইপিএম্এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিএসপির মহাব্যবস্থাপক

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

সোমবার। ৩০ চৈত্র। ১৪০০।

বাড়ির মাটির দেয়ালের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে তারিখটা লেখে জয়নুল মিয়া। ষোল বছর ধরে লিখছে। কোনও বছরে ভুল হয়নি। কিংবা অসুস্থতার কারণে লিখতে পারেনি, তাও ঘটেনি। ঢাকা শহরে কাজ খুঁজতে গিয়ে সময়মত ফিরতে পারেনি, তাও নয়। এই তারিখটি লেখার জন্য ওর জীবনে কোনও অঘটন ঘটেনি।

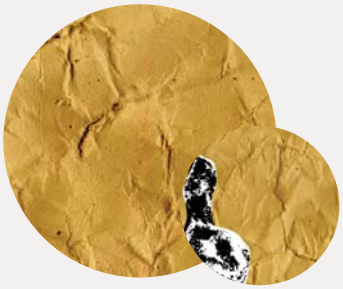

পঞ্চম কন্যার জন্মের খবর শুনে রাগের মাথায় তিন তালাক উচ্চারণ করেছিল জয়নুল। এখন থেকে ষোল বছর আগে। দু'হাতে নিজের চুল চেপে ধরে বলে, তখন আমার মাথায় কিসের ঘূর্ণি পাক দিয়েছিল? পবন নাকি জলরাশি? চিন্তার সময় জয়নুল মিয়ার মাথায় এমন শব্দরাজি ভর করে। কোথা থেকে উড়ে আসে তা ও জানে না। সেদিন কেন আমি এমন একটি কা- ঘটিয়ে ফেললাম!

এখন যদি তার জন্য এতকিছু করতে পারি, তবে সেদিন মনে অন্য কথা ছিল কেন? কেন মুখ থেকে বেরিয়ে বাতাসে আগুন ঝরালো কথাগুলো? তাহলে কি ও মুখে এক, মনে আরেক ধরনের মানুষ? জয়নুল পথের ধারের বড় শিরীষ গাছের নিচে শুয়ে কপাল চাপড়ায়। জয়নুল মিয়ার শূন্য দৃষ্টি তার নিঃসঙ্গতা ঘনীভূত করে। নিঃসঙ্গতা মানসিক যেমন, তেমন শারীরিকও। তারপরও জয়নুল মিয়া কোন নারীর কাছে যায়নি। বলেনি, ভালবাসা চাই এবং শরীরও। ও নিজেই নিজেকে এভাবে ভুলের শাস্তি দিয়েছে।

পঞ্চম কন্যার জন্মের খবর শুনে রাগের মাথায় তিন তালাক উচ্চারণ করেছিল জয়নুল। এখন থেকে ষোল বছর আগে। দু'হাতে নিজের চুল চেপে ধরে বলে, তখন আমার মাথায় কিসের ঘূর্ণি পাক দিয়েছিল? পবন নাকি জলরাশি? চিন্তার সময় জয়নুল মিয়ার মাথায় এমন শব্দরাজি ভর করে। কোথা থেকে উড়ে আসে তা ও জানে না। সেদিন কেন আমি এমন একটি কা- ঘটিয়ে ফেললাম! হায় আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও মাবুদ। এমন বেদনায় কুঁকড়ে গিয়ে বিছানা থেকে নামে জয়নুল মিয়া। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারে ভোরের আলো ফোটেনি। ফর্সা হয়নি চারদিক। ও ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় পা বাড়ালে দেখতে পায় ওর পাঁচ কন্যা গোল হয়ে বারান্দায় বসে আছে। একজন মাটিতে হাতের তালু বিছিয়ে রেখেছে, অন্যরা তেঁতুলের বিচি রাখছে চারপাশে। ওরা গোল হয়ে বসে এমন খেলা খেলে। বাবাকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখে পাঁচজনই একসঙ্গে তাকায় তার দিকে। জয়নুল মিয়া জানে, ওরা আজ ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বাবাকে পাহারা দেবে।

আপনি ঘুমাতে পেরেছেন বাজান?

জয়নুল মিয়া কথা বলে না। উঠোনের কামরাঙা গাছটার দিকে তাকায়। মেয়েরা কেন তাকে এমন ঘিরে রাখে? কেন ওরা বাবার প্রতি রেগে ওঠে না। কেন বলে না, মাকে বাদ দিয়ে যে সংসারে আমাদের রেখেছেন সে কাজটি ঠিক করেননি বাজান! জয়নুল মিয়া ওদের কথার জবাব না দিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামে। শরীরটা কেমন জানি লাগছে। মাথায় ঝিমঝিম ভাব। চোখে ঝাঁঝালো জ্বালা। জীবন নিয়ে কি করবে জয়নুল মিয়া। বেঁচে থাকাই বা–। না, এতকিছু ভাবার দরকার নেই। বেঁচেতো ও আছেই। নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যে দিন ফুরিয়ে যায় তার আর ভালমন্দ কি? জয়নুল মিয়া জানে পাঁচ কন্যা তার জীবনকে আড়াল করে রাখে। গত রাতে ভাত খেতে দিয়ে ওরা বলেছিল, বাজান ঘুমিয়ে পড়েন। রাত হয়েছে।

এখন তো আমার ঘুম আসবে না মায়েরা। আমাকে কেন তোমরা ঘুমুতে বল?

ঘুম আসবে বাজান। ঘুমকে তো তালাক দেওয়া যায় না।

তালাক!

মেয়েরা কথা বলে না। শুধু আগুন ঝরায় দু'চোখে। কথার বদলে কাজটি আরও ভয়াবহ। এমন ভয়াবহ কাজের আড়ালে জয়নুল মিয়া বিশাল দিনের বোঝা টানে। বুঝতে পারে এসব বোঝায় ঘাড়ে ওজন বাড়ে না, ওজন বাড়ে বুকের ভেতর। বুকের কন্দর যেখানে বলে সেখানে। তারপরে কন্দু বয়াতীর মত গুনগুনিয়ে বলে, বন্ধু তোমার পথের দিশা কই? জয়নুল মিয়া জানে তার বন্ধু মুন্সী বয়াতী একথা শুনলে হাহা ক রে হাসবে। তাকে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছোট মেয়ে চম্পা এসে হাত ধরে বলে, বাজান আসেন।

কোথায়?

বারান্দায় চলেন, আমাদের সঙ্গে বসবেন।

বসে কি করব?

আজ আপনার খুব দুঃখের দিন বাজান।

হ্যাঁ, দুঃখ। যাই বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

আজকে আপনাকে আমরা কোথাও যেতে দেব না।

পেছন থেকে শিউলি বলে। বকুল বলে, আপনার দুঃখ আপনার একার না। এ দুঃখ আমাদেরও। চলেন বাজান আপনার কাছ থেকে দুঃখের কথা শুনি।

চল। পাঁচ কন্যা তাকে ঘিরে ধরে। বাজানের মাথার চুল ঠিক করে দেয়। ফতুয়া ঝেড়ে দেয়। তারপর হাত ধরে বারান্দার মাদুরের ওপর বসায়। ওদের মনে হয় বাজান এখন একটা বাইরের মানুষের মত, যেন কোন এক শহর থেকে ফেরার পথে গ্রামের এই বাড়িতে বসেছে দম ফেলার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে তার বুকে হাঁফ ধরেছে। মাথার বোঝাটা খুব ভারী। বারান্দায় উঠে বসলে চম্পা বলে, বুকের ভিতর কথা থাকলে তাকে তালাক দেওয়া যায় না বাজান।

জয়নুল মিয়া খোলা চোখে তাকিয়ে বলে, তালাক!

আপনি এখন আমাদের তালাকের গল্প বলবেন। বলবেন না? বলেন বলবেন? মেয়ে বাবার মুখের ওপর আঙুল নাড়ায়। ও জয়নুল মিয়ার তৃতীয় কন্যা। আঁতুড়ঘরে জয়নুল মিয়া যখন ওকে দেখতে গিয়েছিল তখন ওর মা বলেছিল, আমি ও নাম রেখেছি পদ্ম। ও আমার পদ্মফুল।

মেয়েকে দেখে জয়নুল মিয়ার তেমন কোনও আবেগ কাজ করেনি। আনন্দ বা দুঃখ কিছুই না। রাগ করছিল স্ত্রীর ওপর, কিন্তু তাকে মুখে কিছু বলেনি। পরপর তিনটি কন্যার জন্ম দিয়ে আবার নাম রেখেছে পদ্ম। বলেছে, আমার পদ্মফুল।

আব্বা আপনাকে পানি দেব?

না। আমার পানির পিপাসা পায়নি।

ডাক্তার আপনাকে বেশি করে পানি খেতে বলেছে। আমাদেরকেও বলেছে, আমরা যেন আপনাকে বেশি পানি খেতে দিইনি। তাহলে আপনার কলজে শুকিয়ে যাবে না।

তা ঠিক মা। আমার কলজেয় একসমুদ্র পানি দরকার।

পানির স্রোতে আপনিই বাঁধ দিয়েছেন।

দিয়েছিলাম। তোমাদের তো বলেছি মায়েরা।

প্রতি বছর আপনি দেয়ালে একটি তারিখ লিখেন।

জয়নুল মিয়া তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে, লিখি তো! তোমরা কি আমাকে জেরা করছ মেয়েরা?

না বাজান, আমরা আপনাকে জেরা করি না। এটা আমাদের গল্প। রূপকথা। আপনি বলেন, আমরা শুনব।

বুকটা কেমন ধরে যায় জয়নুল মিয়ার। চারদিকে তাকায়। উঠোনের বেড়ার গায়ে দৃষ্টি আটকে থাকে। ওটা আর বাইরে ছড়ানো যায় না– খুব ইচ্ছে হয়, যদি দৃষ্টি যেতে যেতে যেতে যেতে রাশিদুনের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত পৌঁছে যেত। সেটা হবে না। চারদিকেই বেড়া আছে। ও শুধু দেখতে পায় আলো ফুটেছে। আসলে এখন তো ও তাকালেই দেখতে পায় না। এই আলো ফোটা দেখাটাও মাঝে মাঝে ওর কাছে সত্য বলে মনে হয় না। সত্য হবে কি করে, নিজেকেই প্রশ্ন করে ও। যে ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলে তার সামনে কি

সত্য বলে কিছু থাকে? ভুলটাই থাকে শুধু। আর থাকে ভুলের অনুশোচনা। জয়নুলের জীবনে এই বোঝা ওকে মেয়েদের সামনে বামন করে রেখেছে।

বাজান, গল্পটা বলেন। আমার জন্মের গল্প।

তারপর খিহি ক রে হেসে গড়িয়ে পড়ে পদ্ম। ওর বাবা জানে তার এই মেয়েটি পাঁচ কন্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুরন্ত। ও ভয় বোঝে না। ও শাসন মানে না। স্কুলে ফার্স্ট হয়। এমন মেয়ের বাবা হওয়া কি সহজ কথা। জয়নুল মিয়া চোখ টিপটিপ করে মেয়ের দিকে তাকায়। যেন মেয়েটি বিচারক, আর ও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে এই বারান্দা আদালত। জয়নুল মিয়ার শরীরে শীতল প্রবাহ বয়ে যায়। ও দেখতে পায় ওর পাঁচ মেয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। জয়নুল মিয়া গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে, সেদিন ছিল চোত মাসের শেষ দিন। খরখরে রোদ ছিল চারদিকে। তোমাদের আম্মার প্রসব ব্যথা উঠেছিল সকালে। আমার মা ছিল তোমাদের মায়ের কাছে। আমি দাই ডেকে এনেছিলাম।

দাই ডাকতে যেতে আপনার খুব কষ্ট হয়েছিল, না বাজান?

কষ্ট, কষ্ট কেন হবে? আমার শরীর ভালই ছিল।

খরখরে রোদ ছিল যে? আপনার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। চোত মাসের রোদ খুব খারাপ বাজান।

জয়নুল মিয়া বুঝতে পারে বিষয়টা। কোন কিছু না বলে ঢোক গেলে। পা চুলকায়।

আপনার মনে অনেক ভয় ছিল না বাজান, পদ্ম কথা শেষ না করে খুক করে হাসে। হাসি বাড়ে। হাসতে হাসতে বকুলের গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

থাম ছেমড়ি। বকুল ওকে ধমক দেয়। পাশ থেকে হাস্নুহেনা ওকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে বলে, তোর জন্যই তো আমাদের যত যন্ত্রণা। আবার খিহি ক রে হাসিস, লজ্জা করে না। পদ্ম হাস্নুহেনার কনুইয়ের ধাক্কা উপেক্ষা করে বলে, বাজান আপনার ভয় ছিল এমন যে আবার যদি একটা মেয়ে হয়? তাই না বাজান।

জয়নুল মিয়া কথা না বলে ঠোঁট চাটে। ওদের কথার পাশ কাটিয়ে বলে, দাই আঁতুড়ঘরে ঢুকলে আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। যদি আমাকে আবার দরকার হয় সেজন্য অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতে বেলা বাড়ে। আমার চার মেয়ের খিদে পায়। ওরা উঠোনে ঘুরে ঘুরে কান্নাকাটি করে। খরখরে রোদে আমার মাথা চনচন করে। অপেক্ষা করতে করতে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

আপনার কিসের এত অপেক্ষা ছিল বাজান?

একটি ছেলের। চার মেয়ের পরে আমি একটি ছেলের জন্মের অপেক্ষায় ছিলাম।

আপনার আশা পূরণ হয়নি। তখন আমার জন্ম হয়েছিল। আর মেয়ে হয়েছে শুনে আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

জয়নুল মিয়া চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে তার কথা বলার তেমন কিছু নাই। মেয়েরা এমন কথা সবসময়ই বলে এবং বছরের এই দিনে কথাগুলো তার কাছে নতুন করে পৌঁছয়। জয়নুল মিয়া এভাবে এমন কথা ভাবলে তার ভুলের বোঝা লাঘব হয়। ওদের এসব কথা বলাই উচিত। ও কাছে বসে থাকা ছোট মেয়েটির মাথায় হাত রাখে।

পদ্ম খুক করে হাসে। ওর হাসির একরকম ঢঙ আছে। ঢঙটা সবাই বোঝে, কিন্তু নকল করতে পারে না। দূর থেকে এই হাসি শুনলে ওর পরিচিত জনেরা বুঝতে পারে যে এটা পদ্মর হাসি। ও বলে, আম্মা আমাকে রেখে চলে যাওয়ার সময় আমার নাম রেখেছিল পদ্ম। দাদী আমাকে খুব কষ্ট করে পেলেছিল। হায় দাদী, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মরে গেল।

এই কথা শোনার পরে পাঁচবোন একসঙ্গে শাড়ির আঁচলে বা ওড়নায় চোখ মুছলো। জয়নুল মিয়ার চোখে জল নাই। এক এক করে সব মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। কারও মুখে মাথায় দৃষ্টি বেশিক্ষণ আটকে থাকে। তারপর প্রত্যেকের মাথায় হাত রাখে জয়নুল মিয়া। মৃদুস্বরে বলে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা মায়েরা। জয়নুল মিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাস উড়তে পারে না। দীর্ঘশ্বাস আটকে যায় মেয়েদের বুকে। সেটা প্রবল ঘূর্ণি হয়। জয়নুল মিয়া বুঝতে পারে দীর্ঘশ্বাসও ঘূর্ণির জন্ম দেয়। এখন এই বাড়ির উপর বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি। জয়নুল ভাবল, ঘূর্ণি তাকে ছাড়ল না।

এবার চোখ মুছে শিউলি বলে, আমাদের আম্মার কাছে আমরা সব মেয়েরা ফুলের মত ছিলাম। সেজন্য ফুলের নাম দিয়ে আমাদের নাম রেখেছেন আম্মা।

হ্যাঁ, তোমাদের নাম তোমাদের মায়ের রাখা। জয়নুল মিয়া আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শিউলির নাম আমি জোহরা রেখেছিলাম। তোমার আম্মা রাখতে দেয়নি। আর মেয়েদের নাম রাখা নিয়ে আমার তো শখ ছিল না। আমি ছেলের জন্য একটি নাম ঠিক করেছিলাম। তোমার আম্মা এটা জানতো বলে আমার ওপর রেগেছিল। আমার মাও আমার সঙ্গে রাগ করত। আমি কি গল্পটা শেষ করব?

কেউ কোন কথা বলে না। প্রত্যেকে নিজেদের হাঁটুর ওপর মাথা নামিয়ে রাখে। জয়নুল মিয়া দু'হাত নিজের বুকের ওপর জড় করে। চোখ বন্ধ করে এবং সোজা হয়ে বসে থাকে। যেন কোন এক কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিচারের রায় শোনার অপেক্ষামাত্র। কিন্তু তখন বাড়িতে ঘূর্ণি– ঘটনার ঘূর্ণি বয়ে যায় বাড়ির উপর দিয়ে। গল্পটা ঘূর্ণিই যেন বলে। পাক খেতে খেতে বাড়ির উপর দিয়ে সরিষার খেত পার হয়ে চলে যায় বিন্দুবাসী গ্রামে, যেখানে রাশিদুন চাল ঝাড়তে ঝাড়তে

হাত থামায়। কুলোটা নামিয়ে রাখে নিচে। ওর চারপাশে উড়ে বেড়ায় তুষ– চুলের উপর বিন্দু বিন্দু জমে– মুখের উপরও তুষের আস্তর পড়ে। ঘাড় চুলকালে হাত বাড়ায় রাশিদুন। বুঝতে পারে শরীরের যেখানে যেখানে কাপড় নেই, সেখানে তুষের আস্তর জমেছে। উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি ঝাড়া দিলে কাপড় থেকে দ্বিতীয় দফায় তুষ উড়বে বাতাসে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রাশিদুন। যেন এখন ও কোন এক কাঠগড়ায়। সাক্ষি দিতে এসেছে কারো বিরুদ্ধে। শুনতে পায় ঘটনার দিনের কথা।

উঠোনে দাঁড়িয়ে খরখরে রোদ মাথায় নিয়ে পায়চারি করছিল জয়নুল মিয়া। আঁতুড়ঘরের দরজা ফাঁক করে মা চেঁচিয়ে বলে, তোর মাইয়া হইছে রে বাপ। পঞ্চম কন্যার জন্মের খবর শুনে রাগের মাথায় তিন তালাক উচ্চারণ করে জয়নুল মিয়া। ওর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সবটুকু না শুনেই দরজা বন্ধ করে দেয় ওর মা। মেয়ের নাড়ি কাটা তখনো হয়নি। রাশিদুন দেখতে পায় দাইয়ের হাত থেমে গেছে। নতুন ব্লেডের কাগজটা ছেঁড়া হয়নি পর্যন্ত। সে কান খাড়া করে প্রথমে দরজার দিকে তাকায়, তারপরে রাশিদুনের দিকে। রাশিদুন দাইয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘাড়টা বালিশে কাত করে। মনে হয় প্রসব বেদনার সবটুকু প্রসবের পরে ঘাড়ে এসে জমা হয়েছে। গোলাকার পিণ্ডের মত লাগছে। রাশিদুন আবার অন্য পাশে ঘাড় ঘোরায়। ও বুঝতে পারে উঠোনে দাঁড়িয়ে তালাক উচ্চারণ করার পর জয়নুল মিয়া বারান্দায় উঠে এসেছে।

মুখে মুখে লাগানো দরজার ফাঁক দিয়ে সব কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জয়নুল মিয়া চিৎকার করে তালাক দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে আরও কীসব বলছে তা রাশিদুন শুনতে চায় না। তার শাশুড়ি ছেলেকে বকাবকি করছে ঘরের ভেতর থেকে, যে মানুষ ছেলে বা মেয়ে হওয়া নিয়ে রাগ করে সে আল্লাহর ইচ্ছা মানে না। আল্লাহ মাবুদ পরওয়ার দিগার। তার ইচ্ছার উপর আবার কথা কি! মানুষ এত সাহস করে কেন! ও এর ফল বুঝবে। ওকে কত বুঝিয়েছি, ও মোটেও বুঝদার ছেলে না। ও বলবে, মাবুদ তুমি যা আমার ঘর আলো করে পাঠিয়েছ, তাতে আমি খুশি। আমার ছেলে হলে হবে কি, ও একটা শয়তান ছেলে। রাশিদুনের শাশুড়ি দাইয়ের হাত থেকে বেস্নড নিয়ে নাতনীর নাড়ি কাটে।

প্রসবের কষ্ট শেষ হলেও, নতুন যন্ত্রণা শুরু হয় রাশিদুনের। পরক্ষণে বুঝতে পারে যন্ত্রণা নয়, ক্রোধ ওকে দগ্ধ করে। ক্রোধে চৌচির হয়ে যায় ওর চেনাজানা সবটুকু জমিন– যেমন বাবার বাড়ির বিন্দুবাসী গ্রাম এবং কুড়ি বছর ধরে বাস করা এই হলতা গ্রাম। এখন এই গ্রামটি আর ওর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম থাকবে না এবং বসবাসের জায়গাও থাকবে না। ও কি করবে? চল্লিশ দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত্ব নেবে। মেয়েকে ওর দাদীর হাতে তুলে দিয়ে, বাকী চার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে রেখে, পরনের দুটো শাড়ি বস্নাউজ নিয়ে ছেড়ে যাবে হলতা গ্রাম। আর কোনদিন এখানে আসবে না। একদিনের জন্যও না। মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এই সিদ্ধান্ত নেয় রাশিদুন। ভাবে জয়নুলের মুখ আর দেখবে না। যদি সামনে পড়ে তাও না। মাথার ঘোমটা বড় করে টেনে দিলে দেখার পাট চুকে যাবে। এভাবে চল্লিশ দিন কাটিয়ে মেয়েদের মায়া চুকিয়ে তিন তালাকের দায় মাথায় নিয়ে বাবার বাড়ি বিন্দুবাসী গ্রামে চলে যায় রাশিদুন।

এই ষোল বছরে একদিনও আসেনি এ বাড়িতে। শাশুড়ি মারা যাবার খবর শুনেও না। মেয়েদের অসুখের খবর শুনেও না। তার একটাই উত্তর, ছাড়তে যখন হয়েছে, ছেড়ে এসেছি। দ্বিতীয়বার ঢোকার জন্য ওই বাড়ি ছাড়িনি। ওর এমন সিদ্ধান্তে কেউ বলে সাবাস, কেউ বলে নিষ্ঠুর। রাশিদুন কোন কিছু গায়ে মাখে না। বাবার বাড়িতে নিজের ভাতের জন্য ভূতের মত খাটে। বাবা মারা যাওয়ার পরে ভাইয়ের সংসারেও দিনরাত খাটে। ভাইয়ের বউ কলিমন মাঝে মাঝে হাত থেকে কাজ কেড়ে নিতে চাইলে বলে, ভাত জোগাতে খাটনি লাগে। লজ্জা করতে নাই। নিজের অন্ন নিজে জোগাই না কেন কলিমন? তুমি আমার মায়ের পেটের বোন হলেও আমি এমন খাটনিই করতাম। রাগ করিস না সোনা বোন।

কলিমন রাগ করবে কি, ও জানে ওর স্বামীর বড় বোনটি এমনই। মাথা নিচু করে না। যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণই নিজে করে খায়। শ্বশুরবাড়িতেও এমন করেই কাজ করে ভাত খেয়েছে। শাশুড়ি তার উপর খুবই খুশি। মেয়ের মত আদর করেছে। কুলোর উপর স্তব্ধ হয়ে যাওয়া হাত নড়ে উঠে রাশিদুনের। সে আবার চাল ঝাড়তে শুরু করে। মনে মনে নিজেকে বলে, ৩০ চৈত্র। আজ সেইদিন। আজ মেয়েরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ও চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে বানাবে আজ। এই একদিনই পিঠে বানায় ও। রাশিদুন মনে করে সে এখন সুখদুঃখের বাইরে।

গল্পটা এভাবে এক জায়গায় থামে। কিন্তু জয়নুল মিয়া সুখদুঃখের বাইরে যেতে পারে না। এখন একই ঘূর্ণির মধ্যে আছে। রাগের মাথায় কি করেছে ভেবে নিজের চুল এলোমেলো করে কেটেছিল কাঁচি দিয়ে। লোকেরা যখন জিজ্ঞেস করেছিল, এভাবে চুল কেটেছ কেন, জয়নুল ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেছিল, পারলে টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম। কিন্তু পারি নাইতো। জয়নুল মিয়ার এলোমেলো জীবনের সবটুকু এখন থিতিয়ে এসেছে। এখন আর ও রাশিদুনকে ফিরে পাবার ভরসা করে না। যখন ফেরানোর চেষ্টা করেছিল, তখন ওর সাফ জবাব ছিল, যে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি, সেখানে আর ফিরব না। আবার একটা তিন তালাকের সুযোগ দেব না ওকে। গল্পটা এভাবে থেমেই গেছে।

অনেকক্ষণ পরে শিউলি বলে, আজকে আমরা আম্মার কাছে যাব।

যাবে আমিও জানি। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।

আপনি দূরের বটগাছটার নিচে শুয়ে থাকবেন বাজান। আপনার সঙ্গে আমরা চিঁড়া গুড়ের পুটলি দেব। শবরী কলাও দেব একটা। পানির বোতল দেব। আর কিছু লাগবে?

না। তোমরা আমার অনেক যত্ন কর। মায়েরা আমার– জয়নুল মিয়া দুইহাতে চোখ মোছে। তারপর ভেজা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মায়ের জন্য কি কিনেছ?

আপনি তো জানেন সারা বছর আমরা মায়ের জন্য টাকা জমাই। দুটা শাড়ি কিনি। সঙ্গে ব্লাউজ, পেটিকোট, গামছা, নারকেলের তেল, চিরুনি।

পদ্ম খিহি ক রে হেসে বলে, এবার আমি মায়ের জন্য জরির ফিতা কিনেছি। আমার স্কুল থেকে আসার সময় মনিরের দোকান থেকে ফিতা কিনেছি।

তোমার মা কি জরির ফিতা দিয়ে চুল বাঁধবে?

চুল বাঁধার জন্য তো কিনিনি বাজান। কিনেছি– পদ্ম এক মুহূর্ত থামে। তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

বকুল ধমক দিয়ে বলে, বল কেন কিনেছিস? তুই কি আম্মার সঙ্গে ইয়ার্কি করবি?

হ্যাঁ, ইয়ার্কি বললে ইয়ার্কিই হয়। আম্মার যদি মরতে ইচ্ছে হয় তাহলে জরির ফিতার ফাঁস লাগিয়ে মরবে সে জন্য কিনেছি।

হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পদ্ম বলে, যে মেয়ের জন্মের জন্য মায়ের তালাক হয় সেই মেয়ের মনে মরণ ছাড়া আর কোন চিন্ত্মা থাকে না।

দুই লাফে উঠোনে নেমে চারদিকে পাক খায় পদ্ম। সবাই জানে কষ্টের দ্বিমুখী স্রোত পদ্মের ভেতরই সবচেয়ে বেশি। ওর কান্না থামানোর জন্য কেউ এগোয় না। সবাই জানে ও নিজে নিজেই শান্ত হবে।

চম্পা জিজ্ঞেস করে, বাজান কখন রওনা দেব?

তোমরা সবাই পান্ত্মাপানি খাও। তারপর তৈরি হও। তোমরা যখন বলবে আমি তখনই রওনা দেব। এই যাত্রা তো তোমাদের মায়েরা। আমার না।

ভাল করে বেলা ওঠে। রোদ ছড়ায়। ছোট ছোট পুটলি নিয়ে রওনা করে ছয়জন মানুষ। সবার আগে জয়নুল মিয়া। হাতে চিঁড়ে গুড়ের পুটলি। প্রত্যেকের হাতে তাদের মায়ের জন্য কিছু না কিছু আছে। একটি কই মাছ ভাজা। দুটো বড় টেংরার দোপেঁয়াজাও আছে ওদের সঙ্গে। মা আর কি খেতে ভালবাসে তা ওদের মনে নেই। বাজানকে জিজ্ঞেস করলে বাজান কিছুই বলে না। এই ব্যাপারে সে বোবা হয়ে যায়।

সবাই মিলে যাচ্ছে বিন্দুবাসী গ্রামে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

প্রবন্ধ

তাতা থৈ থৈ

সুজয় সোম

আমার দিদিমার মামাতো দাদার নাম সুকুমার রায়। ডাকনাম তাতা– রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে পাওয়া উপন্যাস *রাজর্ষি* থেকে হাতানো। আমি কোন ছার, আমার মায়ের জন্মেরও ঢের আগে স্বর্গে গেছেন– মোটে ৩৫ বছর ১০ মাস ১০ দিন বয়সে। ছ'ফুটের কাছাকাছি ঢ্যাঙা। একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। গালে মস্ত একটা আঁচিল। বলিষ্ঠ চেহারা। বেপরোয়া মনের জোর। গুরুগম্ভীর এবং আমুদে। কী উচ্ছল প্রাণশক্তি! যেখানেই যেতেন, হাসি-গল্প আর গানের স্রোত। তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর উপস্থিতির অভিঘাতে কী-একটা ম্যাজিক বা অসাধারণত্ব, যেটা আলোর মত ঝরে পড়ত! মনে মনে আজও তাঁকে 'তাতাদা' বলে ডাকি। আমার সঙ্গে মোলাকাত হয়নি তো কী, খুব ছোটবেলা থেকেই পেয়ারের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে দিনরাত তাতাদার গল্প এত শুনেছি, তাঁর লেখা খেয়ালরসের সব বই এনে দিয়েছে মা– পড়ে-পড়ে মগজস্থ, কাঁচা বয়সেই আমার জীবনের জলজ্যান্ত নেতা বনে গিয়ে এমন পেড়ে ফেললেন আমাকে– একেবারে তাতা থৈ থৈ!

৫২-পৃষ্ঠার ওই যে খুদে কাব্যগ্রন্থ *আবোল তাবোল*– সুকুমার রায়ের প্রথম বই এই পার্থিব জগতে অনন্ত ডানা মেলেছে তাঁর মৃত্যুর ন'দিন পরে। ওই একটা বই দিয়েই বাংলা শিশুসাহিত্যের– বঙ্গদেশের সাবালক সমাজেরও– মেজাজ বদলে দিলেন। এ-জাতের ছড়া-কবিতা নোবেল প্রাইজ-পাওয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখতে পারেননি। লাল গানে নীল সুর– উদ্ভট, আজগুবি ও ফাজলামোর চূড়ান্ত! তারি সঙ্গে নির্মল কৌতুক। কী ঝমঝমে মিল বসানো! তাজা রস, খাঁটি রস। ছন্দ আর শব্দের অসম্ভবের খেলাতেও কী অপূর্ব ঝংকার! শব্দের বুনোন কত-না রঙ ঢেলেছে! অমন সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসেবহীন খ্যাপামির মানে না বোঝার কি জো আছে?

স্বয়ং কবির আঁকা অমন আজগুবির তা লাগানো অপরূপ মলাটকে দুনিয়ার কোনও শিল্পী আজ পর্যন্ত টসকাতে পারেননি। মৃত্যুশয্যায় বালিশে ঠেস দিয়ে আধশুয়ে ওই তিনরঙা মলাট এঁকেছেন, ডামি কপিতে গোটা বইয়ের লেআউট করেছেন তাতাদা। একশো বছর হতে চলল– বাঙালি জাতির চিন্তা করার একটা বলিষ্ঠ ধরন তৈরি করেছে এই বই।

কবি নিজেই সব ছবি এঁকেছেন যতরাজ্যের হাঁস আর সজারুকে ব্যাকরণ না-মানার সন্ধিতে মিলিয়ে। মানেটা অমনি পা-জড়িয়ে টুক করে ঝুলে পড়ে, চাঁদনি রাতেও উড়ে যেতে দেয় না কিছুতেই। লেখার সঙ্গে পড়িমরি পাল্লা দিয়ে বাপ রে কী টইটম্বুর জুটি! এমন ছবির কোনও পূর্বসূরি নেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু চিন্তাও করেননি। এ একেবারে সুকুমার রায়ের নিজস্ব ভাষায় দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম, দেড়ে দেড়ে দেড়ে! শব্দ ছন্দ ছবি মিলেমিশে পৃথিবীকে চেনার নতুন ঢঙ। ভীষ্মলোচন শর্মার গানের গুঁতো, বিদঘুটে গল্পবাজ কাতুকুতুবুড়ো, ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ে নাজেহাল পালোয়ান, হারুদের আপিসের ট্যাঁশগরু– এ-বইকে হাসির দর্শনশাস্ত্র বলা চলে। তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম। আমাদের বেঁচে-থাকা ও সুখ-দুঃখের মূলে যত রহস্য, বেমালুম ফাঁস! স্বয়ং কবির আঁকা অমন আজগুবির তাক লাগানো অপরূপ মলাটকে দুনিয়ার কোনও শিল্পী আজ পর্যন্ত টসকাতে পারেননি। মৃত্যুশয্যায় বালিশে ঠেস দিয়ে আধশুয়ে ওই তিনরঙা মলাট এঁকেছেন, ডামি কপিতে গোটা বইয়ের লেআউট করেছেন তাতাদা। একশো বছর হতে চলল– বাঙালি জাতির চিন্তা করার একটা বলিষ্ঠ ধরন তৈরি করেছে এই বই। ভাবনায় জোর পেয়েছি আমরা। দিকনির্দেশ করেছে। মন গড়ে দিয়েছে আমাদের।

তাতাদার কলম থেকে অফুরন্ত ঝরনার মত কুলকুল করে ঝরে পড়েছে এমন উঁচুদরের কাব্য। এ-জিনিস কাউকে শেখানো যায় না। বীজমন্ত্রটা বুকপকেটে নিয়ে জন্মাতে হয়। এরজন্য দরকার ঈগলপাখির মত দুনিয়া দেখার চোখ, নারীর মত কোমল হাত। ও-দুটোই সুকুমার রায়ের মোক্ষম অস্ত্র। তাতাদা জানতেন বুদ্ধি আর সাহসের রাজ্যে অসম্ভব বা আজগুবিরও ভারী আদর। তেমনি বিজ্ঞান এবং কাব্য একে অন্যের বিরোধী নয়, বরং ওরা পরস্পরকে সম্পূর্ণতা দেয়, অর্থময় করে তোলে। সরসতা মানে খেলো ঠাট্টা বা ছেঁদো রসিকতা না। নিছক ভাঁড়ামো বা চটুল রংতামাশা নয়। সরসতা গভীর জিনিস। তার মধ্যেই গোটা জীবনদর্শন। টগবগ করে ফুটতে থাকে সর্বদা। রঙ বদলায়। নিত্যিনতুন সুর বেরোয়। সে যে মহাকালের সঙ্গী। মস্ত প্রাণীজগতে খালি মানুষেরি আছে হাসবার ক্ষমতা। বুদ্ধির খুঁটি না-পেলে অবশ্য সরসতা পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ে। হাসি-কান্না হিরে-পান্না। একই পরম সত্যের এ-পিঠ ও-পিঠ। চারদিকের বিশ্বপ্রকৃতি, আমাদের নশ্বর জীবনটাও কী অদ্ভুত আনন্দ আর মজা এবং আহ্লাদ দিয়ে ঠাসা! একে ঘেন্না বা দুচ্ছাই করতে হয় না। সবচাইতে গোলমেলে ব্যাপার– আহা, সুকুমার রায়ের মজার মজার ছড়া ও কবিতা, গল্প আর নাটক থেকে– গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ থেকেও– সাংঘাতিক সব বাণ সটাং আমাদের পাঁজরা ঘেঁষে লাগল। নিজেদের চিনতে কারও বাকি রইল না। মিথ্যে বা ভড়ঙের কোনও জায়গা নেই। ঝপ করে বাস্তবের মুখোশ গেল খসে।

কলেজজীবনেই গুষ্টিসুদ্ধ ভাইবোন আর বন্ধুদের জুটিয়ে দল পাকালেন। 'ননসেন্স ক্লাব'। তাতাদার বাড়িতেই– উত্তর কলকাতায় ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটে– হুলোড়-আমোদের হাট বসে গেল। থেকে থেকেই আজগুবি গানের আসর। কত-না উদ্ভট বিষয় নিয়ে আড্ডা। নাটকের রিহার্সালেও কী মজা! কাঁচাবয়েস থেকেই তাতাদা জাতগোপ্পে এবং ভয়ংকর তার্কিক। ডানপিটে ও সাহসী। নতুন নতুন খেলা তৈরি করতে, খেলা জমাতে, এমনকী ঝগড়া মেটাতে ওস্তাদ। কী ফূর্তিবাজ! সবার সঙ্গেই খালি রগড় আর মস্করা। তেমনি দয়ার অবতার। বাস্তবের মাটিতে হাসির জিনিস বলে কিছু নেই। হাসি থাকে আমাদের চোখে, মনে, বুকের ভেতরে। আর কোথাও না। আজগুবি হল মানুষের জীবনের ওপর সরস মন্তব্য। 'ননসেন্স ক্লাব'-এর সব সদস্যের একটা করে ছদ্মনাম বানালেন তাতাদা। যেমন, মঙ্গলা মাসোরার গ্যোচ্ছো। জাপানর্মা সাবানসোর। স্পাইফক্স মেটেহেন। মাখনলাল ভজুয়া। যতই গোলমেলে শোনাক, এ-সব নামকরণের পেছনে এমন মজবুত আর ন্যায্য কারণ কিলবিল করছে, দলের সকলেরি নামগুলোকে লাগসই মনে হল। প্রতিটা আড্ডা বা অধিবেশনের শুরু সদস্যদের সমবেত গানে– ক্লাবের প্রতীকীসঙ্গীত– রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরি' নাটক থেকে জোগাড় করা। যেন 'ননসেন্স ক্লাব'-এর স্বপ্ন, মেজাজ ও আদর্শের খুঁটিতেই বাঁধা হয়েছে গানটা!

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল ॥
নাহি জানি করণ-কারণ, নাহি জানি ধরন-ধারণ
নাহি মানি শাসন-বারণ গো–
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল ॥
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো–
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো–
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল ॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।
আমরা জুটে সারা বেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো–
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল ॥

['ননসেন্স ক্লাব'-এর হাতে লেখা মাসিকপত্রের নাম 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা'। কলকাতার পথেঘাটে তখন ফেরিওয়ালাদের নানান সুরের হাঁক শোনা যেত 'সাড়ে-ব-ত্রি-শ ভা-জা–! তালপাতার খুদে ভেঁপুর মত পাকানো ঠোঙায় বত্রিশ রকমের ভাজাভুজি আর মশলার মাথায় আধখানা ভাজা

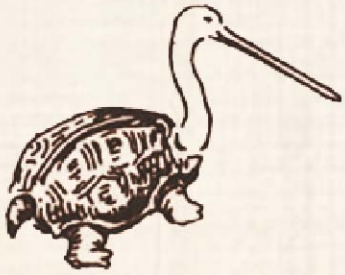

লঙ্কা, সেই স্বাদ ও গন্ধের 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা' পত্রিকার বেপরোয়া সম্পাদক তাতাদা। নিজেই বেশি লিখেছেন। মলাট এবং ভেতরের আজগুবি ছবিগুলো নিজে আঁকতেন। গম্ভীর বিষয়ের লেখাও থাকত। ছদ্মনামেও লিখলেন অনেকেই। তাতাদার একটা ছদ্মনাম 'উহ্যনাম পণ্ডিত', বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনেরও ছায়া পড়েছে 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা'য় তাতাদার কবিতায়: 'লর্ড কার্জন অতি দুর্জন বঙ্গগগন শনি/ কূট নিঠুর চক্রী চতুর উগ্র গরল ফণী।' সম্পাদকের পাঁচমেশালি ঠাট্টা-আলোচনার পাতাটার নাম 'পঞ্চ-তিক্ত পাঁচন'। নামটা কিঞ্চিৎ তেতো তেতো হলেও ব্যাপারটা ভারী মুখরোচক, বড়রাও খুব মন দিয়ে পড়তেন। সুকুমার রায়ের টিটকিরি, রগড় আর মস্করায় কোনওকালে কেউ আঘাত পায় না। শুধুই মজা, নির্মল আনন্দ। 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা'র একটা সংখ্যায় দেখা গেল এমন রঙ্গরস-রচয়িতার নাম না বললেও চলে।

বিজ্ঞাপন

আমাদের গন্ধবিকট তৈলের নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন। অ্যাঁ? শোনেননি? আমরা একমাস ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেরাসিনের টিন বাজিয়ে বাজিয়ে তেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে হয়রান হ'য়ে গেলাম, আর আপনি একদম শুনলেন না! তবে শুনুন।

এই তৈল ঘরে রাখলে গন্ধের তেজে মশা, ছারপোকা, উকুন, আরশুলা সব মরে যাবে। চোর, ডাকাত, পাগলা কুকুর এসব ঘরে প্রবেশ করবে না। মানুষ তো দূরের কথা, ভূত পেত্নী পর্যন্ত পোঁটলা-পুটলী নিয়ে বাপ-বাপ ব'লে দৌড়িয়ে পালাবে।

'ননসেন্স ক্লাব'-এর দলবল নিয়ে অভিনয়ের জন্য তাতাদা প্রথম নাটকটা বাছলেন তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'কেনারাম ও বেচারাম'। সে-থিয়েটার দেখে লোকে এমন তেড়েমেরে ধনি-ধন্যি করতে লাগল, নিজেই নাটক লেখায় মন পাকালেন। পরপর লিখে ফেললেন 'রামধনবধ', 'ঝালাপালা' 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'চলচিত্তচঞ্চরী', 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'। টইটম্বুর খুশির নাটক। ফুর্তির নাটক। সামাজিক টিটকিরির নাটক। বাঙালিজাতির আত্মসমালোচনার নাটক। সব নাটকই মঞ্চাভিনয়ের আগে প্রকাশিত হয়েছে 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা'য়। নিজেই সবাইকে পাখিপড়া করে অভিনয় শেখাতেন, গান শেখাতেন। কোনওকালেই সুকুমার রায়ের থিয়েটারে মঞ্চসজ্জা বা পোশাক বা মেকআপ-এর বালাই থাকত না। শুধু কথায়, সুরে আর হাবভাবে, হাত-পা নাড়ায় অভিনেতা ও পরিচালকের বাহাদুরি ফুটে উঠত। হাঁদারামের পার্ট করতে তাতাবাবুর কোনও জুড়ি ছিল না।

শিলং শহরের উপকণ্ঠে পল্টনের চাঁদমারিতে একটা চড়িভাতির গল্প জানি। আমার দিদিমার মামাতো বোন লীলা মজুমদারের কাছে শুনেছি। খানিকটা বন, তারপর ঘাসজমি। পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে কুলকুল বয়ে যাচ্ছে নদী। কিছু দূরে একটা ঝরনা। ঝরনার নাম পরিতলা। লম্বা-লম্বা সরলগাছের তলায় শিরশিরে পাহাড়ি হাওয়া। বড়-বড় গালচের ওপর শিলঙের পরিজনরা বসে। একটা খাতা-হাতে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটা পড়তে লাগলেন তাতাদা। আমাদের মহাকাব্যের কাহিনি ও কুশীলবদের ছদ্মবেশে মধ্যবিত্ত বাঙালিবাবুদের নিয়ে ইয়ার্কি-ফাজলামো। সে কী অদ্ভুত মুখভঙ্গি, কথার ঢঙ, গলার ওঠা-নাবা, হাত-পা নাড়া! যখন যে ভূমিকা পড়লেন তাতাদার চেহারাটাও থেকে-থেকেই পাল্টে যাচ্ছে– দিব্যি সেই লোকটা বনে গেলেন! রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান। তারি সঙ্গে নাটকের সব গানের কথা, নিজেরি বাঁধা সুর, গানের গলা ও গায়কি মিলেমিশে কী নির্মল, নির্ভেজাল রসের উৎসব! জাত আজগুবে না হলে আজগুবির চাষ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার-দলেও অভিনয় করেছেন। কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির 'বিচিত্রা' ক্লাবে একবার *বৈকুণ্ঠের খাতা* নাটকে কেদারের ভূমিকায়। বৈকুণ্ঠের ছোটভাই অবিনাশের সহপাঠী কেদার। বড় পার্ট, নাটকে আগাগোড়া মহাব্যস্ত। পাঁচ-সাত মিনিটের একটা দৃশ্যে তাতাদার নিঃশব্দ অভিনয়ের মুন্সিয়ানার গল্প ছোটবেলা থেকে আমার দিদিমার কাছে এতবার শুনেছি, সেদিন-যে সটাং ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে দর্শকদের মধ্যে দিদিমার পাশের চেয়ারেই গ্যাঁট হয়ে বসে ছিলাম না, নিজেরি বিশ্বাস করা কঠিন। দৃশ্যটা এরকম: বৈকুণ্ঠবাবুর ঘরে ঝাপসা আলো-আঁধারিতে চাদর গায়ে হৃষ্টপুষ্ট কেদারবাবু পা-টিপেটিপে ঢুকে কুলুঙ্গির ওপর থেকে কাঠের পাটা-বাঁধা বিরাট 'স্বরসূত্রসার' পুঁথিটা বগলদাবা করে চুপি চুপি দে চম্পট। না, রবীন্দ্রনাথের মূল নাটকে এ দৃশ্য নেই। সেবারের অভিনয়ে মজাটা জুড়ে দিয়েছেন নাট্যপরিচালক রবীন্দ্রনাথ।

বিলেতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের একগাদা কবিতা ইংরেজিতে তরজমা করেছেন তাতাদা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও কবিমানসের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম পরিচয় ঘটালেন *দ্য স্পিরিট অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর* প্রবন্ধটা লিখে। বিলেত গেসলেন ফোটোগ্রাফি আর ছাপাখানাবিদ্যের পুঁজি বাড়াতে। বিলেতে বসেই নিজস্ব পরীক্ষাগারে গভীর গবেষণা। কেজো যন্ত্র বানালেন নিজের নকশায়। বিলেতের ছাপাপদ্ধতির কিছু কিছু মারাত্মক ভুল চিহ্নিত করেছেন। প্রতিবাদ করলেন বিলিতি বিশেষজ্ঞদের গোয়ার্তুমির। মুদ্রণবিষয়ে বৈজ্ঞানিক সূত্রের সিঁড়ি বেয়ে দার্শনিক ভাবনার প্রবন্ধ লিখলেন বিলেতের কাগজে। বিলেত থেকেই সদ্যোজাত *সন্দেশ* পত্রিকার জন্য টাটকা লেখা ও ছবি পাঠিয়েছেন বাবাকে। উৎকৃষ্ট *সন্দেশ* ছাপার কারিগরী পরামর্শও দিলেন। কাঁচাবয়স থেকেই যখনি প্যারোডি লেখার সাধ হয়েছে তাতাদার, বেছে নিয়েছেন রবিঠাকুরের গান। শান্তিনিকেতনে একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই সেদিনের জমপেশ চড়িভাতির রিপোর্ট দিতে হই হই করে গেয়ে উঠলেন: 'সেই তো ভাল লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়। ডালের বনে খ্যাপা খাওয়া, সেই তো আমার পেটকে মাতায়।'

'আবোল তাবোল' বা 'খাই খাই' থেকে 'হ য ব র ল' বা 'পাগলা দাশু', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি', বা 'অবাক জলপান', থেকে 'দ্রিঘাংচু' বা 'ভাষার অত্যাচার'– সুকুমার রায়ের সব লেখাতেই কেমন-একটা আত্মীয়তার ভাব। তেমনি চিরকেলে আধুনিক। চাঁচাছোলা বাঙালি মেজাজ। সটাং আমাদের বুকের ভেতরে টোকা দেয়। মনে জোর আসে। নকল কিছুর জায়গা রাখেননি। মেকি জিনিস তাচ্ছিল্য করেছেন। চাপানো উপদেশ বা ব্যাখ্যানা বা কৈফিয়ত দেননি কখনও। গুরুমশাই সাজেননি। ওই নির্লিপ্ত সততার তলায় তলায় টলটলে সরসতার নদী। অহংকার ও মিথ্যাচারকে টিটকিরি মেরেছেন চিরটাকাল। এতটুকু তিক্ততা নেই কোথাও। ভণ্ডামি নেই, গ্লানি নেই, মালিন্য নেই। ওষুধ বানানো হবে বলে তো আর গমখেতের ধারে পপিফুলরা ফুটে ওঠে না। এমন মোক্ষম স্যাটায়ার বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। কখনও টইটম্বুর নস্টালজিয়া। কোথাও-বা ট্রাজেডি আর কমেডি এবং ফার্স ঘেঁটে গেছে। হাসি হচ্ছে

দুনিয়া দেখার মোক্ষম একটা ঢঙ। হাসি মানে ছ্যাবলামি নয়। রঙ্গরস করতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে চেঁচেপুঁছে বিলিয়ে দিতে হয় নিজেকে। রোজকার জীবনের তলায় তলায় সরসতার যে স্রোত বইছে, এলেবেলে পাথর সরিয়ে তার মুখটা খুলে দিতে হয়। এমন খাঁটি রসের আদি নেই, অন্ত নেই। দেশ কাল পাত্র নেই। ক্ষয় নেই, লয় নেই। সুকুমার রায় রচনাবলি সেই অনাদি সত্যের জ্যান্ত প্রমাণ। বাংলাভাষা- জানা পৃথিবীর সব মানুষের হিরে-মুক্তোর খনি, সাত রাজার ধন।

বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে নতুন দল পাকালেন। 'মণ্ডা ক্লাব'। আজগুবির চাষবাস আরও বল পেল, গতি পেল, সাহস পেল। কী দারুণ হাসির তুফান, মনখোলা ফুর্তির ঝড়! প্রথম তিনটে অধিবেশনের পর– মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রম বাদ দিলে– ফি সোমবারে সভা বসত বলে দলের নাম রাখা হল 'মানডে ক্লাব'। নানান সদস্যের বাড়িতে দিব্যি মগজ আর মন পাকাবার আসর। কত জল্পনা এবং গবেষণা। নতুন লেখা পাঠ। রসালাপ। গুরুগম্ভীর ও গরম তর্ক-বিতর্ক, নারদ নারদ। সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান। শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, আইন-আদালত, ইতিহাস। সৌন্দর্যতত্ত্ব, নাট্যকলা, ধর্ম, অর্থনীতি। পে-ট্টা, নীৎশে, রুডইয়ার্ড কিপলিং, শেক্সপিয়ার, তুর্গেনিভ বা অস্কার ওয়াইল্ড থেকে শেলি, টেনিসন, রবার্ট ব্রাউনিং, হুইটম্যান, জন রাস্কিন, এমিলি ডিকিনসন। মনু, কালিদাস, রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে নিও-ন্যাচারালিজম, বৈষ্ণবকবিতা, দুর্ভিক্ষ, বাংলাভাষায় ফার্সির ছাপ, চিন ও জাপানের বর্ণমালা, উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প, বিদেশে বাঙালি বা জুট ইন্ডাস্ট্রি। এমন গমগমে সাবালক আড্ডায় পাঠ করার জন্য– বৈদগ্ধ আর সরসতার ঠেকোয়– সুকুমার রায়ও লিখে ফেললেন 'এস্থেটিক সুপারস্টিশন্‌স্', 'ফাংশান্‌স্ অফ আর্ট', 'ক্রিটিসিজম্‌স্– ট্রু অ্যান্ড ফল্‌স্'। 'জীবনের হিসাব', 'দৈবেন দেয়ম্', 'ক্যাবলের পত্র'। তাছাড়াও গানবাজনা, নাটকাভিনয়, রবীন্দ্র সংবর্ধনা, বার্ষিক উৎসব। মাঝে মাঝে আউটডোর অধিবেশন বা উদ্যানযাত্রা ওরফে চড়িভাতি। কোন্নগরে, শিবপুরে, কোলাঘাটে, বরানগরে, গোবরডাঙায়। আলিপুর চিড়িয়াখানাতেও। বৈঠক যেখানেই হোক, এমনই খাই-খাই আর ভূরিভোজের বহর– এমন কী বিশেষ ভোজন অধিবেশন বা সরবতী মেলা– হিংসুটেরা 'মানডে ক্লাব'-এর চিরস্থায়ী নাম রাখলেন 'মণ্ডা ক্লাব'। তাতাদার তরজমায় 'মণ্ডা সম্মিলন'।

তার মানে, 'মণ্ডা ক্লাব'-এর ঝরনায় ভূরিভোজন আর সরসতার স্রোতে জ্ঞান-বিদ্যে পাচার হল অফুরন্ত। মন ও মগজের মেদ ঝরেছে। উৎকৃষ্ট তর্ক বা ঝগড়ার নিত্যিনতুন কসরত শেখা গেল। হুড়মুড় করে বোধ আর বুদ্ধি খুলেছে। শুধু বই পড়ে এতকিছু হয়? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভূরিভোজের ফর্দটা মোটামুটি এরকম: ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট, সিঙারা, কচুরি, নিমকি, চপ, রুটি বা পরোটা, আলুর দম, পেস্তা ও বাদাম দিয়ে চিঁড়েভাজা। কালোজাম, বালুসাই, সন্দেশ, জিলিপি, পান্তুয়া, রসগোল্লা, পিঠেপুলি। চা, ঘোলের সরবত, লেমন সিরাপ, জাফরান-দেওয়া দই, গরমকালে কুলপি বরফ। নানা ঢঙের পান থাকত রোজই। কোন্নগরের চড়িভাতি-অধিবেশনে ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে যাওয়া হল চাল-ডাল, ডিম, রুটি, মাখন, জেলি, ফুলকপি, বেগুন, মটরশুঁটি, রাঙাআলু, সন্দেশ, পান। হালকা মেঘের পানসে ছায়াও নির্ঘাত চেটে দেখেছেন ওঁরা।

নিন্দুকরা যতই 'লিটেরারি অ্যান্ড গ্যাসট্রোনমিকাল ক্লাব' বলে টিটকিরি দিক, এ-দলের অনেকেই নিজেদের গড়েপিটে তিলে-তিলে সমাজের মাথা হয়ে উঠেছেন– ১৯ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের আশ্চর্য উত্তরাধিকারী। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংগীতকার-ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন। কবি ও পদার্থবিজ্ঞানী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। দার্শনিক কালিদাস নাগ, শ্রীশচন্দ্র সেন। কবি অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজনীতিক কিরণশঙ্কর রায়। শিক্ষাবিদ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। সাহিত্যিক-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, হিরণকুমার সান্যাল। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অমলচন্দ্র হোম। চিকিৎসক দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। শিশুসাহিত্যিক সুবিমল রায়। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। আর কত নাম করব? হিরের মত ঝিকমিকে ওই বেপরোয়া যুবকদের ঝলমলে নেতা সুকুমার রায়, আমার পেয়ারের তাতাদা। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে 'মণ্ডা ক্লাব'-এর বৈঠকে এসেছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী চারু রায়। আড্ডা মারতে মারতে গান জুড়েছেন কবি ও সংগীতকার কাজী নজরুল ইসলাম, গায়ক-অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে, দর্শনিক এবং কবি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৫০ বছর পেরিয়ে হরীন্দ্রনাথকে আমরা চিনেছি তাতাদার ছেলে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়। *গুপী গাইন বাঘা বাইন*-এর জাদুকর বরফি, *সীমাবদ্ধ*তে স্যার বরেন রায়, *সোনার কেল্লা*র সিধুজ্যাঠা।

'মণ্ডা-সম্মিলন'-এর তৃতীয় জন্মদিনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সবিনয়ে পেশ করলেন ক্লাবের প্রতীকীসংগীত, সবাই মিলে গাইতে হবে রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের সুরে।

আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন!
– আরে না- তা' না না–
আমাদের মান্‌ডে-সম্মিলন!
আমাদের হলারই কুপন!
তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া,
কভু পশুশালে হাঁস্‌পাতালে আজব আমন্ত্রণ!
(কভু কলেজ-ঘাটে ধাপার মাঠে ভোজের আকর্ষণ!)
মোদের চারুবাবুর দধি,
মোদের কারু ঘোলের নদী,
মোদের জংলীভায়ার সর্‌বতে মন মাতাল অদ্যাবধি!
মোদের আলোচনার রীতি
দেশে জাগায় বিষম ভীতি,
কভু ভেয়ার্‌হারেন উঁকি মারেন, ভ্যাম্বেরী, ভিলন!
মোদের গানের বিপুল বেগে
পাড়া আঁৎকে ওঠে জেগে,
ঢিল ছুড়িতে সুরু করে বেজায় রেগেমেগে।
মোদের নাচ যদি পায়, তবে
কি যে হয় শোনো তা সবে–
নাগ বাসুকীর ঘাড় খচে যায়, হয় ভূমিকম্পন!
(নাগ কালিদাস হয় কাবু হায়, পায় দশা খোদন!)
মোরা হপ্তা বাদে জুটি
সবাই হাঁপিয়ে ছুটোছুটি,
রাধাবল-ভ মন নেইকো, রাধাবলভী বেশ লুটি!
মোদের কালোর সঙ্গে সাদায়
এই যে মিলিয়েছে দই-কাদায়
মোটার সঙ্গে কাহিলকে ভাই করেছে বন্ধন!
আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন!

চিন্তার জঞ্জাল সাফ করাটাই আজগুবির উদ্দেশ্য। তাহলেই মন খুশি, ভসভসিয়ে হাসি পাবে। কী জন্যে কোন মানুষ

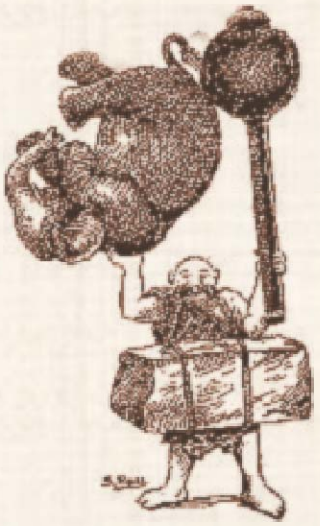

কখন হেসে ওঠে বা মজা পায়, তাই দেখে ওই লোকটার মনের যতটা নাগাল পাওয়া গেল, আর-কোনও মগজাস্ত্রের তদন্তে সেটা সম্ভব না। আজগুবি খেয়ালের স্রোতে থেকে-থেকেই গদ্যে অথবা পদ্যে 'মণ্ডা ক্লাব'-এর আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হত সদস্যদের কাছে। সে-সব সাংঘাতিক চিঠির তলায় যাঁর নামই ছাপা হোক, সকলেই জানতেন কীর্তিটা তাতাবাবুর। একবার ক্লাবের সর্বজনস্বীকৃত অনাহারী সম্পাদক খোদনবাবু ওরফে শিশিরকুমার দত্তাধিকারী– বাপের পদবি 'দত্ত'র সঙ্গে স্বোপার্জিত 'অধিকারী' উপাধি জুড়ে 'দত্তাধিকারী'– আপিসের কাজে ক'দিনের জন্য পাটনায় গেসলেন, হই হই করে হুলিয়াচিঠি বেরিয়ে গেল।

হায়! হায়, সম্পাদক হারাইয়া গিয়াছেন, নতুবা তহবিল তছরুপ করিয়া পলাতক হইয়াছেন! সদস্যগণ গড়পারে হাজির হইয়া কিংকর্তব্য যেন নির্ধারণ করেন।

সে সময়ে গ্রেসাম ইন্সিওরেন্স কোম্পানির বাংলা-বিহারের সংগঠক ছিলেন শিশিরকুমার। তাই উড়োচিঠির এককোণে ইংরেজিতে লেখা হল:
'ইন্সিওর ইউথ গ্রেসাম অ্যাট ওয়ান্স।'

মণ্ডা ক্লাব-এর আমন্ত্রণপত্রে সুকুমারী কবিতারও কী বাহার!

সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায়
ক্লাবটি ত যায় যায়!

তাই বলি, সোমবারে
মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।

রকমারি পুঁথি যত
নিজ নিজ রন্নচিমত
আনিবেন সাথে সবে
কিছু কিছু পাঠ হবে।

করযোড়ে বার বার
নিবেদিছে সুকুমার।

অনাহারী সম্পাদকের মহাচটিতং জবানিতেও পত্রকবিতা লিখেছেন তাতাদা।

আমি, অর্থাৎ সেক্রেটারি
মাস তিনেক কল্‌কেতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে–
অম্‌নি কি সব গেছে ফেঁসে !!

বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া!
চিন্তা নেইক গভীর বিষয়–
আমার প্রাণে এ সব কি সয়?

এখন থেকে সম্‌ঝে রাখ
এ সমস্ত চল্‌বে নাকো–
আমি আবার এইছি ঘুরে,
তান ধরেছি সাবেক সুরে।

শুনবে এস সুপ্রবন্ধ
গিরিজার 'বিবেকানন্দ'
মঙ্গলবার আমার বাসায়।
(আর থেক না ভোজের আশায়)।

*১৪ মে, ২৫ নং সুকিয়া স্ট্রীট

আর-একটু ভাল করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে দেয় আজগুবি। 'মণ্ডা ক্লাব'-এর জন্মদিনের নেমন্তন্নচিঠিতে তাতাদা একবার ভারিক্কি গাম্ভীর্যের চাষ করলেন এইভাবে:

জন্মোৎসব

ভক্তিবিনয়ভাবগদগদধূলিলুণ্ঠিত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমেতৎ–
আগামী ২১ আগস্ত আসন্নগোধূলিলগ্নে শ্রীশ্রীক্লাবের তৃতীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে মেয়ো হাঁসপাতাল ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের ইষ্টককুঞ্জে ভক্তসমাগম ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইবে। মহাশয়, উক্ত উৎসবক্ষেত্রে পদারবিন্দরজ অর্পণ করতঃ কীর্ত্তনকোলাহলে যোগদানপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তম-লীকে ও এই দাসানুদাসকে কৃতকৃতার্থ করিবেন। ইতি

কৃতাঞ্জলি সেবকাধম
শ্রীশিশিরকুমার দত্তদাসস্য

সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীক্লাবের কীর্তনকোলাহল বোঝার জ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে আমন্ত্রণলিপির আরও দুটো নমুনা হাজির করা খুব দরকার।

আঃ! আবার খাওয়া!

এইত সেদিন সবাইকে বুঝিয়ে বল্‌লুম যে আর 'খাই খাই' ক'রো না– এর মধ্যে আবার সুনীতিবাবু খাওয়াতে চাচ্ছেন! আমার হাতে কতগুলো টাকা গছিয়ে দিয়ে, এখন বল্‌ছেন, না খাওয়ালে জংলিবাবুকে দিয়ে মোকদ্দমা করাবেন। আমি হাতে পায়ে ধ'রে নিষেধ কর্‌লুম, তা তিনি কিছুতেই শুন্‌লেন না, উল্টে আমায় তেড়ে মারতে আস্‌লেন! দেখুন দেখি কি অন্যায়! তা আপনারা যখন আমার উপদেশমত চল্‌বেন না, কাজেই অগত্য সুকুমারবাবুকে ব'লে ক'য়ে এই ব্যবস্থা ক'রে এসেছি যে তাঁর বাড়ীতে আগামী মঙ্গলবার (৩০ শে জুলাই) সন্ধ্যা ৭টার সময় আপনি সুস্থদেহে হাজির হবেন। সুনীতিবাবুর ভোজের পাত সেইখানেই পড়্‌বে। এখন খুশী হলেন ত?

ত্যক্তবিরক্ত
শ্রী সম্পাদক

তেড়েফুড়ে লাগলে আকাট মুখ্যুও মহাপণ্ডিত হতে পারে, সরসতা কাউকে শেখানো যায় না। খাঁটি রসের ভাণ্ডটা বগলদাবা করে আসতে হয় মাটির পৃথিবীতে।

প্রতিবাদ সভা

সম্প্রতি ক্লাবের সর্ব্বজনস্বীকৃত সম্পাদকরূপে আমি 'অধিকারী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ 'সভ্য' অসঙ্গতভাবে আপত্তি করিতেছেন। কালিদাসবাবু আপত্তি করিতে চান করুন, কিন্তু আমি স্বোপাজ্জিত উপাধি ছাড়িব না।

এই প্রকার অন্যায় আপত্তির বিশেষ প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়। অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম, আগামী মঙ্গলবার ২১ আগষ্ট, বাংলা তারিখ জানি না, আমাদের ক্লাবের জন্মদিন, অর্থাৎ প্রায় জন্মদিন। ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় ১০০ নং গড়পার রোড, অর্থাৎ কালাবোবা ইস্কুলের পশ্চাতে, সুকুমারবাবু নামক ক্লাবের একজন আদিম ও প্রাচীন সভ্যের বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছে। বক্তা প্রায় সকলেই। সভাপতি আপনি, বিষয়ও গম্ভীর– সুতরাং খুব জমিবার সম্ভাবনা।

আসিবার সময় একখানা সেকেন্ডক্লাশ গাড়ী সঙ্গে আনিবেন– আমায় ফিরিবার পথে নামাইয়া দিতে হইবে; খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে। ইতি,

শশব্যস্ত
শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী
সুযোগ্য সম্পাদক।

সুকিয়া স্ট্রিটের কাছেই ১০০ নম্বর গড়পার রোডে তাতাদার নিজের বাড়ির দোতলায় 'মণ্ডা ক্লাব'-এর আড্ডাঘরে কম উঁকিঝুঁকি মারেননি রায়পরিবারের হিন্দু ও ব্রাহ্ম ললনারা। আমার দিদিমার কাছেই শুনেছি– হরদম অমন ঘুরঘুর

করার একটা জোরালো কারণ তাতাদার সুপুরুষ বন্ধু কেদারনাথ। *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড়ছেলে। শুধু কিশোরীরা কেন, বেথুন কলেজে-পড়া বাড়ির তরুণীকুল এবং তাঁদের সখীরাও 'কেদারদা' এলে চাঞ্চল্য প্রকাশ করতেন। ছোটদের জন্য সুকুমার রায়ের আঁকা প্রথম ছাপা-ছবি এই কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবম হাজাম' গল্পে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত *সন্দেশ* পত্রিকায়।

উপেন্দ্রকিশোর স্বর্গে যাবার পর ঠিক সাত বছর আট মাস *সন্দেশ* সম্পাদনা করেছেন সুকুমার রায়। চোখজুড়নো মনমাতানো *সন্দেশ*। কোথাও একটা এলোমেলো সুতো ঝুলে নেই। শিক্ষা, আনন্দ এবং শিল্পবোধের সঙ্গে নতুন বিস্তার জুড়ে দিলেন। শুধুই হাস্যরস নয়, সে-হল আজগুবির খেয়াল! আকাশের গায়ে তাই টক-টক গন্ধ। এক-একটা কথাই এক-একটা মৌমাছির চাক। চুলবুল করছে, গমগম করছে। মধুতে ঠাসা এবং হুল ফোটার ভয়। আদর্শ কখনও টসকায় না, কিন্তু পাল্টে গেল *সন্দেশ*-এর মেজাজ। বাংলা সাহিত্যকে একটা আজগুবি মন উপহার দিলেন তাতাদা। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল বা জীবনকথা থেকে জীবজন্তু-পোকামাকড় আর শিল্প-সংস্কৃতির গল্পও শোনালেন হাসি-ঠাট্টা সরসতায়। ন্যাকামি নেই কোথাও, পণ্ডিতি জ্ঞান দেবার চেষ্টা নেই। খোকামো নেই, পাকামি নেই। বুড়োমি নেই, বোকামো নেই। মানবসভ্যতার ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সঙ্গে ঘেঁটে গেল খেয়ালরসের অনন্ত ভাণ্ডার। যাঁরা সদাই প্যাঁচার মত হাঁড়িমুখো বা রামগরুড়ের ছানা, *সন্দেশ*-এর জন্য লেখা পাঠাতে মানা করলেন তাঁদের। সম্পাদকমশাইয়ের খাঁটি চেহারাটা পদ্মফুলের মত ফুটে উঠল। হাসিখুশি, দিলদরিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হাসি শুধু কথার খেলা নয়, তার ভেতরে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বপ্রেমের আলো ঝলমল করে।

আহা, সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগতে টুপ করে ঢুকে পড়তে একটুও তোড়জোড় লাগে না। মানে বুঝতে আকাট মুখ্যুদেরও অসুবিধে নেই। সবকিছুই জলের মত টলটলে, রোদের আলোর মত স্বচ্ছ। মোদ্দা কথাটা আমাদের বুকের মধ্যে গুঁজে দিলেন। তাতাদার গল্পের টগবগে দুষ্টু ও খ্যাপা ছেলেরা দুরন্ত ঠাট্টা-তামাশায় কেবলই নাজেহাল করে সেইসব ভাল ছেলেদের, যারা দেমাকি বা হিংসুটে বা চালিয়াত বা ছ্যাঁচড়া। হুঁকোমুখো হ্যাংলা বা বেরসিক বড়দেরও অপদস্থ করেছে হাসি আর মজায়, নির্মল রসিকতায়। বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ই প্রথম লেখক, যিনি ছোটদের চোখ দিয়ে দেখা বেপরোয়া ইশকুলজীবনকে– বালক ও কিশোরদের চিরকেলে নিজস্ব জগৎকে– টইটম্বুর জ্যান্ত করে তুললেন! সময়ের তালে বদলে যায় বাইরের ভোলটুকু, মনের ভেতরটা পাল্টায় না কখনও।

একটাও অর্থহীন কথা বলেননি তাতাদা। মিচকেমি বা টিটকিরি থাকলেও, তেতো ব্যঙ্গ নেই কোথায়। একশো বছর পেরিয়ে গেল– আমাদের একঘেঁয়ে, নীরস, এলেবেলে জীবনে অফুরন্ত দখিন হাওয়ার সুড়সুড়ি। কত কথা কুমড়োপটাশ বা গোমড়াথেরিয়ামদেরও ভাবিয়ে তোলে। বোম্বাগড় থেকে শুরু করে সুকুমার রায়ের রাজারা সকলেই আমাদের হাসির পাত্র। রাজতন্ত্র আজ আর নেই পৃথিবীতে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের ছোট-বড়-মাঝারি রাজাদেরও ওই একই কাণ্ড দেখে ওরকমি ভসভসিয়ে হাসি পায় আমাদেরও। রোদেরাঙা ইঁটের পাঁজার ওপরে বসে রাজারানিরা ঠোঙাভরা বাদামভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না। দেশ ও সমাজে সর্বনেশে একুশে আইনের গেরো আজও আমাদের ছাপোষা জীবনকে খিঁমচে ধরে, গুঁতোয়। ওদিকে সেই জমকালো আইনের ফাঁক গলে কত দুষ্কৃতকারী দিব্যি ঠ্যাং নাচায়, নয়তো বুক ফুলিয়ে সমাজের মাথা হয়ে উঠেছে। ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম বাকুম, ভৌ ভৌ ভৌ চিঁহি। সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ আমাদের বুকের মধ্যে পুরে দিয়েছেন বেপরোয়া সাহস, মানুষকে ভালবাসার চেতনা, অনন্ত কল্পনাশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধ। তারিসঙ্গে সুকুমার রায় জুড়ে দিলেন চিরকেলে সরসতা।

সুকুমার রায়কে বলা যায় কলকাতার প্রতীক। ছেড়ে কথা-বলার মানুষ ছিলেন না কোনওকালে। অন্যায় বা মিথ্যাচার বা নিষ্ঠুরতা দেখলে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতেন। কী টগবগে ব্যক্তিত্ব! কলেজজীবনেই টের পেলেন যুবকরাই দেশের সব চাইতে জোরালো মূলধন। তাদের গড়েপিটে একটা বলিষ্ঠ আর সৎ শক্তিতে দাঁড় করানো দরকার। 'ননসেন্স ক্লাব' আর 'মণ্ডা ক্লাব' পেরিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদলেরও মধ্যমণি বা প্রাণভোমরা হয়ে উঠলেন। তার ভিত বলতে বিজ্ঞানীমন, দেশপ্রেম ও যুক্তিবাদ। স্বদেশিগান বেঁধেছেন, এমনকী ব্রহ্মসংগীত। কোনও ব্যাপারে গোঁড়ামি সইতে পারতেন না। অতি সাধারণ মানুষকে ভালবেসে, তাঁদের জন্য কিছু করে উঠতে পারাটাই তাতাদার জীবনের মধ্যিখানের খুঁটি। প্রাণ ছাড়া, স্বপ্ন ছাড়া কেউ বাঁচে? সমাজসেবা মানে ফন্দিফিকির বা দলাদলি কি বাগবিতণ্ডা বা ধান্দাবাজি বুঝতেন না। চিন্তারাজ্যে কারও দাসত্ব করা চলে নাকি? বাস্তবের গায়ে রসের প্রলেপ লেগে থাকবে। তার ওপর বুদ্ধির আলো পড়বে। তবেই না সত্যকে চেনা যাবে!

রূপকথার গল্পেও কিছু কথা থাকে, যার ভেতরে খালি চোখের জল। মোটামুটি ৫০ দিন কম ৩৬ বছর– এটা কি একটা মরে যাবার বয়স? সাবালক বাঙালিসমাজকে অজস্র ধারায় যে সম্পদ দিতে পারতেন সুকুমার রায়, তার কণাটুকু দেবারও সুযোগ পেলেন না। জীবনের শেষ দু'-আড়াই বছরে রোগশয্যায় ভাষা ও ছন্দের আশ্চর্য খেলায় মাতলেন। 'শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব'। বাংলা কাব্যে অনুপ্রাসের যে টলটলে নদীটা আদিকাল থেকে বয়ে চলেছে কুলকুল করে, তারই এক চমকপ্রদ আধুনিক রূপ। অনুপ্রাসের অনুক্রোণ। স্বরবর্ণের 'অ' থেকে শুরু করে ব্যঞ্জনবর্ণের 'ছ'-এ পৌঁছেই ফুরিয়ে গেল তাতাদার নশ্বরজীবন। শুধুই বাংলা বর্ণমালার তত্ত্বকথা নয়, এই অসম্পূর্ণ কাব্যের অণু-পরমাণুতে লেপ্টে আছে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যিখানে আমাদের জীবনরহস্য, বেঁচে থাকার আর্তি ও আহ্লাদ। প্রথম স্তবকেই বিশ্বব্রহ্মা- ঘিরে বৈজ্ঞানিক ঘাম আর রক্ত:

পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান ঘুচিবে পথে ধাঁধা
দেখিবে গুণিয়া এ-দিন দুনিয়া নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে জড়সন্ধিতে বস্তুপিণ্ড ফাঁকে
অনু-অবকাশে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোতা সেথা জড়ের পি- আকাশ প্রলেপে ঢাকা
নয়কো কেবল নিরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
'ইথার' পাথারে তড়িত বিকারে জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে॥

গম্ভীর সব বিষয়ের সরস প্রবন্ধগুলোতেও তাতাদার প্রতিভা ও আগ্রহের এক-একটা স্বপ্নরাজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক সংকট, কিংবা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা। চাঁচাছোলা সুকুমার রায় আতসকাচের তলায় আমাদের দেখালেন–

যত আধুনিক ধর্মই হোক, ধর্মকে খুঁটি বানিয়ে সমাজকে শোধন করতে চাইলে কী কী খানা-ডোবা, নদী-পাহাড়, চোরাবালি আসবেই। এমনকী আইজাক নিউটন থেকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অব্দি যে ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞান বয়ে এসেছে, ২০ শতকের গোড়া থেকে সেই বিদ্যায় কতখানি মৌলিক এবং গভীর পরিবর্তন ঘটতে লাগল। তার মানে, ২০ শতকের সব চাইতে রহস্যময়– প্রায় সমাধানহীন– দুটো ধাঁধাকে ট্যাঁড়া পিটিয়ে চিহ্নিত করার মেধা ও মনীষা অতি কম বয়সেই মুঠোয় পুরেছেন তাতাদা। ভাবনা চিন্তার ঢঙ এমনই, ওই দুটো সাংঘাতিক আতান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে সজোরে আঘাত করার মত কী তীব্র মনের চোখ! একই সুতোয় গাঁথা দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মগজাস্ত্রের মাপে। এই তো, নানা রঙের, নানা ঢঙের ধর্মীয় বা মৌলবাদী দলবলের উসকানিতে আমাদের চারদিকে শেকড়-ফুঁড়ে কী বিকট সব সংকট পেখম মেলেছে– আজকের পৃথিবীর নানাদেশে বেপরোয়া সামাজিক দুর্বিপাক! আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে গোলকধাঁধার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন সুকুমার রায়, দুনিয়া-জুড়ে বিজ্ঞানীরা একশো বছরেও তার সমাধান খুঁজে খুঁজে হদ্দ!

আরও কত পরিচয় তাতাদার। দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, শিল্পতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ। এমনকী তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোরের পর সুকুমার রায়ই একমাত্র ভারতীয়, যিনি গুটেনবার্গ-পরবর্তী যুগের মুদ্রণশিল্পে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, একেবারে বিজ্ঞান-গবেষণা ও আবিষ্কার। সেই আবিষ্কারের কাহিনিও ফলাও করে লিখেছেন। বিজ্ঞানীমন, বিজ্ঞানচর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য তাঁর আজগুবি বা উদ্ভট বা বাঁধনছেঁড়া কল্পনায়, তাঁর সব কাজেই খবরদারি করেছে। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, লালন ফকির বা সুকুমার রায়ের মত মানুষদের গানের পালা সাঙ্গ হলেও, তাঁদের কণ্ঠ বোবা হয় না কখনও। চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা দিয়ে তৈরি দুনিয়া-দেখার চশমাটাও দিব্যি থেকে যায় আমাদের জন্য।

ও হ্যাঁ আমার দিদিমা কনকলতা রায়ের কাছে বারো চোদ্দং ৩১৮ বার শোনা গল্পটা বলতেই ভুলে গেছি। যাঁর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাতাদার, বেথুন কলেজে-পড়া সেই মেয়েকে একদিন নেমন্তন্ন করে আনা হল হবু শ্বশুরবাড়ি। গোধূলির আলোয় কনে দেখার আসরে গান শোনাতে বলা হল। হবু বরের ডাকনাম জানেন না তখনও, জানেন না হবু দাম্পত্যের আয়ু টেনেটুনে বছর দশেক, রবীন্দ্রনাথের গান ধরলেন টুলুদি– যেন রত্নপোর বাঁশিতে সুর কুলকুল করছে:

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালমন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ–
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥

সুজয় সোম
ভারতের সাংবাদিক, গদ্যকার ও চলচ্চিত্রনির্মাতা

ভারত সম্পর্কে নিয়মিত জানতে লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

অনুবাদ গল্প

গ্রীষ্মের দিন

কমলেশ্বর

শুল্ক আদায়ের অফিস বেশ রঙচঙে। গেটে ধনুকের আকারে বোর্ড। পেন্টার সৈয়দ আলীর পাকা হাতের কাজ। দেখতে দেখতে শহরের চারধারে অনেক দোকান খুলে গেল, সবার দোকানেই সাইনবোর্ড। এগুলো দোকানের ইজ্জৎ বাড়িয়েছে। অনেক দিনের কথা। দীননাথ ময়রার দোকানে প্রথম সাইনবোর্ড লাগার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের দুগ্ধখাবার খ দ্দেরের সংখ্যা বেড়ে যায়। সাইনবোর্ড টাঙানোর যখন খুব ধুমধাম পড়ে গেল তখন নানান ধরনের লতাপাতা আঁকা নতুন সাইনবোর্ড লাগানো শুরু হল। 'ওঁ' 'জয়হিন্দ' কথা থেকে শুরু করে 'একবার পরীক্ষা করে দেখুন', 'ভেজাল প্রমাণে ১০০ টাকা পুরস্কার' ইত্যাদি নানান ধরনের শ্লোগান দেখা যেতে লাগল।

শুল্ক অফিসের নাম তিন রকম ভাষায় লেখা। চেয়ারম্যান সাহেব খুব বুদ্ধিমান লোক। ওঁর সুনাম চারধারেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রত্যেকটি সাইনবোর্ডই লেখা হয় হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজিতে। অনেক দূর দূর থেকে নেতারা বক্তৃতা দিতে আসেন, দেশবিদেশ থেকে যাত্রীরা আগ্রার তাজমহল দেখে পূর্ব্বভারত পরি ভ্রমণে যান এরই ওপর দিয়ে... তাঁদের মনেও এইসব সাইনবোর্ড রেখাপাত করে। সাইনবোর্ডের রঙ ফেরে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে

লোকটি দোকানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৈদ্যজী ব্যাপারটা কী তা আঁচ করে নিলেন। লোকটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোনরকম উৎসাহ দেখালেন না। কিন্তু লোক দেখানো ভদ্রতা তো কিছু আছে। বলা তো যায় না আজ বাদে কাল এই লোকটা কিংবা ওর বাড়ির কোন লোক তো রুগী হয়ে আসতে পারে। নিজের ব্যবহার আর নিজের পেশার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, ভাল তো?'

সঙ্গে– মেলাটেলার সময় ময়রার দোকানের, জুলাই-আগ স্ট মাসে বইখাতার, বিয়ের মাসে কাপড়ের দোকানের আর অসুখবিসুখের মরশুম দেখা দিলে হাকিম বৈদ্যের। সস্তায় কাজ সারে দেশি ঘিয়ের দোকানদাররা। খোলার চালের ঘরেই গেরুয়া কিংবা লাল মাটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। এ সব বাদ দিলে চলে না। মুরুব্বিচালে বৈদ্যজী বললেন, 'আজকালকার দিনে পোস্টার বিনা সিনেমাওয়ালারাও কল্কে পায় না। বড় বড় শহরে কেরাসিন তেলের দোকানেও দেখবে সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ড না হলে এতটুকুও চলে না। এতে ছেলেপুলেদেরও নাম লেখা হয়, আর তা না হলে নাম রাখার দরকারটাই বা কি। সাইন বোর্ড টাঙিয়ে সুখদেববাবু কম্পাউন্ডার থেকে একেবারে ডাক্তার হয়ে গেলেন, এখন হাতে ব্যাগ নিয়ে চলেন!'

পাশের রামচরণ আর এক মজার খবর দিল। 'কাল সুখদেব ডাক্তার বুধুইএর এক্কাগাড়িটা নাকি কিনেছেন...'

'চালাবে কে?' টিনের চেয়ারে পা মুড়ে বাবু হয়ে বসে পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

'এ সব পকেট কাটার কায়দা', বৈদ্যজীর মনে তখনও এক্কাগাড়ির কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। 'বড় বড় ডাক্তারদের মত আমাদের এই ডাক্তারও রোগীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করবে আর সহিসকে বকশিস পাইয়ে দেবে। এই জন্যেই ডাক্তারদের এত বদনাম। ভ্যালা জিজ্ঞেস কর দিকিনি, ও ডাক্তারি করবে না নিজের ডাঁট দেখাবে। ইংরেজিতে 'ডাক্তার' লিখেই তো রুগীদের প্রায় আধমরা করে ফেলে। আয়ুর্বেদে নাড়ী দেখার কথা তো বাদই দিলাম, শুধু রুগীদের চেহারা দেখেই রোগের কথা বলে দেওয়া যায়। এতে এক্কাগাড়ি কি করবে? কিছুদিন পরেই দেখবে, ওর সহিস কম্পাউন্ডার বনে গেছে।' এই কথা বলে বৈদ্যজী খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলেন। একটু থেমে আবার বললেন, 'কে কি বলবে বল? ডাক্তারি তো এখন ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উকিল মোক্তারের ছেলেরাও ডাক্তার হচ্ছে। যার কাজ তারেই সাজে, এই তো জানি। বৈদ্যর ছেলে বৈদ্য হবে, বাপের নাম্মযশ পা বে। বৈদ্যর ছেলে ছোটবেলাতেই শেকড়বাকড় নি য়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অর্ধেক ডাক্তারি শিখে ফেলে। তোলা, মাষা, আর রতির এমন টনটনে জ্ঞান হয়ে যায় যে ওষুধ কিছুতেই ভুল হতে পারে না। ওষুধের কাজ ওর তৈরি করার পদ্ধতিতেই... ধন্বন্তরি... বৈদ্যজী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু একজনকে দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলেন। যারা মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছিল তাদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সবাই তাঁর রুগী।

লোকটি দোকানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বৈদ্যজী ব্যাপারটা কী তা আঁচ করে নিলেন। লোকটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোনরকম উৎসাহ দেখালেন না। কিন্তু লোক দেখানো ভদ্রতা তো কিছু আছে। বলা তো যায় না আজ বাদে কাল এই লোকটা কিংবা ওর বাড়ির কোন লোক তো রুগী হয়ে আসতে পারে। নিজের ব্যবহার আর নিজের পেশার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, ভাল তো?' মাথা থেকে একটা ক্যানেস্তারা বৈদ্যজীর সামনে নামিয়ে রেখে লোকটি বলে, 'ঠাকুর সাহেব এখানে এটাকে রাখতে বলেছেন, একটু দেড়টা নাগাদ হাট থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন।'

'ও সময় দোকান বন্ধ থাকে', ফালতু এইসব ঝঞ্ঝাটে একটু বিরক্ত হয়ে বৈদ্যজী জবাব দিলেন। 'হাকিম বৈদ্যের দোকান সারাদিন খোলা থাকে না, এটাতো আর বেনের দোকান নয়।' ভবিষ্যতে লোকটা কাজে আসতে পারে ভেবে জবাব দিলেন, 'যাক গে, ওঁর কোন অসুবিধে হবে না, যদি এ সময় আমি দোকান বন্ধ করে চলে যাই তো পাশের দোকানে রেখে দিয়ে বলে যাব।'

লোকটা চলে যেতেই বৈদ্যজী বলে ওঠেন, 'মদ খেতে মানা করলে কি হবে? যেদিন থেকে এই আইন চালু হয়েছে, সেদিন থেকেই ঘরে ঘরে তাড়িখানা তৈরি হয়েছে। এখন খেজুর রস ঘিয়ের দামে বিক্রি হয় আর এই ডাক্তারদের কি বলব, যেন মচ্ছোব লেগে গেছে। লাইসেন্স পেয়েছে ওষুধ বলে, কিছু ঠেলে জিঞ্জার বিক্রি করছে সবার নাকের ডগায়। ধরাও পড়ে না। আমরা যদি গাঁজাআফিম এক পুরিয়া রাখ তে চাই তো তার হিসেব্লপ ত্তরের সাতশো ল্যাটা।'

'আরে এসব তো দায়িত্বের ব্যাপার,' পণ্ডিতজী জবাব দেন। এখন শুধু দায়িত্বশীল বৈদ্যরাই আছে। এদের সবার রেজিস্ট্রিও হয়ে গেছে। আজেবাজে যারা ঢুকে পড়েছিল, তাদের সবার কাটছাঁট হয়ে গেছে। যে বৈদ্য রেজিস্টার্ড সেই শুধু চিকিৎসা করতে পারে। যারা চূরণ বিক্রি করে রাতারাতি বৈদ্য হয়ে উঠেছিল... এখন সব খতম। লক্ষ্ণৌতে সরকারি অনুসন্ধান হবার পর সব ঠিক হয়ে...'

বৈদ্যজীর এইসব নীরস কথাবার্তায় পণ্ডিতজী উঠে পড়লেন। বৈদ্যজীও ভেতরে যাবার জন্য উঠলেন। চন্দর তাঁর ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ডটা লিখছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সাদা রঙটা বড্ড গাঢ়, একটু টারপিন তেল মিশিয়ে নাও।' বলেই একটা বোতল উঠিয়ে নিয়ে এলেন, বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে 'অশোকারিষ্ট'।

এইরকম ওষুধের নামে বোতলে কি জিনিস যে ভরা আছে তা বলা মুশকিল। সামনের আলমারিটাতে বড় বড় বোতলে ঠাসা। বোতলের গায়ে লেবেল আটকানো। লেবেলে হয় কোন না কোন অরিষ্টের নাম, নয়তো কোন না কোন মাদকদ্রব্যের নাম লেখা। তাকের প্রথম সারিতে বোতলগুলো সাজানো। পেছনের সারিতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস। সামনের টেবিলে একসারি সাদা শিশি, কোনটাতে মুখরোচক হজমি কিংবা লবণ ভাস্কর ইত্যাদি। বাকিগুলোতে কি যে ভরা আছে তা শুধু বৈদ্যজীই জানেন।

টারপিন তেল মিশিয়ে চন্দর লিখে যেতে লাগল– প্রোঃ কবিরাজ নিত্যানন্দ তেওয়ারী।' ওপরের লাইন 'শ্রীধন্বন্তরী ঔষধালয়, বৈদ্যজী নিজেই লিখেছেন। সাদা অক্ষরগুলো মনে হচ্ছিল যেন তুলো দিয়ে লেখা হয়েছে। তারও ওপরে বেশ খানিকটা জায়গা খালি দেখে বৈদ্যজী বললেন, 'ওহে বাবু, ওপরে জয়হিন্দ লিখে দাও... আর এই জায়গাটায় একটা দ্রাক্ষাসারের বোতলের ছবি আর ঐ জায়গায় একটা খল্লনুড়ি এঁ কে দাও... ড্রইং আমিও আট ক্লাস অবধি করেছি, কিন্তু এখন তার অভ্যেস নেই।'

চন্দর মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিল। ভাবছিল, শুধু শুধু এ এক ঝুটঝামেলা। হাতের লেখা ভাল হওয়ার খেসারত। বলল, 'কোন পেন্টারকে দিয়ে নয় করাতেন... খুব সুন্দর করে লিখে দিত, অত সুন্দর কিন্তু আমাকে দিয়ে হবে না।' ঘাম মুছতে মুছতে হাতের তুলিটা মাটিতে রেখে দিল।

'পেন্টার দু'লাইন লিখতে পাঁচ টাকা হেঁকেছিল। নিজেরা মেহনত করে দশবা রো আনাতে সেরে দেওয়া গেল। রঙটি তো রুগী দিয়ে গেছে। ইলেকট্রিক কোম্পানির পেন্টার বদহজমে ভুগছিল। দু'পুরিয়া ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়াতে সে দু'তিন রকমের রঙ ও কিছুটা ভার্নিস দিয়ে গেছে। দুটো বাক্স রঙ হয়েছে, এই বোর্ডটাও তৈরি হল। আরও এক্ক আধটা চেয়ারও রঙ করা যাবে... তুমি শুধু

রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমশ কমে আসছে। অফিসবাবুরা সব চলে গেছে। সামনে শুল্ক অফিসের খসখসে জল দেওয়া শুরু হয়েছে। দূর থেকে 'লু'এর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতায় খস খস শব্দ ভেসে আসে। ঠিক এই সময় একটা লোক ওঁর দোকানে উঁকি মারল। বৈদ্যজী দুঃখের কাহিনি বলে চলেছিলেন। লোকটিকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। লোকটিকে চট করে চিনতে পেরে একটু সাবধান হয়ে গেলেন।

এইটুকুই লিখে দাও, লালরঙের শেড আমি চড়িয়ে নেব... মার্জিনে একটা ফ্ল্যাগ এঁকে দেবে নাকি? দিয়েই দাও।'

চন্দর গরমে অস্থির। দুপুর যত গড়াচ্ছে রাস্তার ধুলো ও 'লু'এর জোরও তত বাড়ছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে চন্দর এই অনুরোধ এড়াতে পারল না। পাখার ডাঁটি দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বৈদ্যজী ঠিকে গোমস্তাদের বড় বড় রেজিস্টার টেনে নিয়ে ছড়াতে লাগলেন।

রোদে পোড়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দোকানের একটা পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে বৈদ্যজী খালি রেজিস্টারগুলোতে খতিয়ান ও পরচার নকল তুলতে লাগলেন। এঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে চন্দর জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি বৈদ্যজী?'

বৈদ্যজী মুখ কাঁচুমাঁচু করে বললেন, 'শুধু বসে থেকে কি করব, তাই কিছু কাজ করছি। নতুন যারা সব খাতা লেখে, তারা কাজকর্ম কিছুই তো বোঝে না, রোজই নায়েব আর কানুনগোর কাছে বকুনি খায়... ওরা ঠিকে কাজ না করিয়ে যাবেটাবা কোথায়, পুরনো ঘাগী গোমস্থা আর ক'জনটাবা আছে, সবকিছুই যাদের নখদর্পণে। নতুন এই সব গোমস্থাদের জন্যে পুরনোদের ভাত মারা যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, কাজ এখনও পুরনোরাই তুলছে। এইভাবেই নতুন গোমস্তাদের টাকা সব নয়ছয় হচ্ছে। পেটের জ্বালা এদেরও আছে। চাষাদের ধাপ্পা দিয়ে কাজটা নিয়ে আসে। না নিয়ে এলে খাবেটাবা কি? দু 'চারজন এই রকম গোমস্তার কাছ থেকে আমিও কিছু কাজ মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকি। নকল করতে হবে, তাই রেজিস্টারগুলো ভরছি।'

রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমশ কমে আসছে। অফিসবাবুরা সব চলে গেছে। সামনে শুল্ক অফিসের খসখসে জল দেওয়া শুরু হয়েছে। দূর থেকে 'লু'এর স ঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতায় খস খস শব্দ ভেসে আসে। ঠিক এই সময় একটা লোক ওঁর দোকানে উঁকি মারল। বৈদ্যজী দুঃখের কাহিনি বলে চলেছিলেন। লোকটিকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। লোকটিকে চট করে চিনতে পেরে একটু সাবধান হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে বললেন, 'একটা সাইনবোর্ড আগ্রাতে করতে দিয়েছি, যতদিন না তৈরি হয়ে আসে, ততদিন এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। এ সবের পেছনে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়...' খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করেন, 'কি খবর হে, কেমন আছ?'

'ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই, কোসমা স্টেশনে খালাসীর চাকরি করব', নীল পোশাক পরা খালাসীটা জবাব দেয়।

ওর কি ধরনের সার্টিফিকেট লাগবে সেটা আঁচ করে বৈদ্যজী জিজ্ঞেস করলেন, কবে থেকে কোন তারিখ অবধি তোমার সার্টিফিকেট চাই?'

'পনেরো দিন আগে এসেছিলাম বৈদ্যজী। আরও সাত দিনের চাই।'

মনে মনে একটু খতিয়ে নিয়ে বৈদ্যজী বললেন, 'দেখ, সার্টিফিকেট ঠিক মত দিয়ে দেব, সঙ্গে সরকারের দেওয়া রেজিস্ট্রি নম্বরও দেব কিন্তু বাপু নগদ চারটে টাকা লাগবে।' বলে ফেলে বৈদ্যজী ভাবলেন লোকটা চার টাকা শুনে ভেগে না যায়। তাই একটু হাতে রেখে বললেন, 'আগের জন্যে সার্টিফিকেট দিতে না হলে দু'টাকাতেই হয়ে যাবে...'

শুনে খালাসী বেশ একটু দমে গেল, বৈদ্যজীর ঘাম্ন শপশপে মুখে আরও বেশি হতাশার রেখা ফুটে উঠল। 'বৈদ্যজী, সোবরন সিং আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে', খালাসী সব আশা ছেড়ে দিয়ে বলল। ভাবখানা এই যে কাজটা সোবরন সিংএর, তার নয়। বৈদ্যজীর ধড়ে প্রাণ এল। বললেন, 'সে আমি আগেই বুঝেছি। আরে, জানাশোনা না থাকলে সার্টিফিকেট আমি দেইও না, মান্ন ইজ্জতের ব্যাপর। আমি কি করেটাবা জানব, তুমি কোথায় থাকতে, কি করতে? এটাও তো ভাবতে হবে, শেষে বিশ্বাস করে কি প্রাণটা হারাব। পনেরো দিন আগের তারিখ দিয়ে তোমার নাম রেজিস্টারেতে চড়াতে হবে, রোগের নাম লিখতে হবে, তারপরের সব ক'দিনই রেজিস্ট্রারে তোমার নাম লিখতে হবে। এ সব কি মামার বাড়ি আবদার...' বলতে বলতে চন্দরের দিকে তাকালেন তার সম্মতি পাবার আশায়। চন্দরও সায় দিয়ে বলল, 'বৈদ্যজীবা কি ক রে হাত গুণবেন যে তুমি সত্যিই অসুস্থ ছিলে না ডাকাতি করে বেড়িয়েছ। বাবা, সরকারি মামলা...'

'পাঁচ টাকার কমে ভুভার তে কেউই তোমায় সার্টিফিকেট দেবে না...' এই কথা বলতে বলতে বৈদ্যজী খতিয়ান রেজিস্টারটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'বলে, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই। এই দেখ এই নামগুলো, দেখতে পাচ্ছ না। রোগীর কথা নয় বাদই দিলাম, সরকারকে দেখানোর জন্যেও রুগীদের পুরো রোজনামচা এই রেজিস্টারে ওঠাতে হয়। প্রত্যেকটি রুগীর নাম, ধাম, আয় আর রোগের নাম এই খাতায় লিখতে হয়। তোমার নামও এতে চড়াতে হবে। এখন বল দেখি, রুগী দেখা বিশেষ জরুরি, না এই দু'চার টাকার জন্যে সার্টিফিকেট দিয়ে সরকারি ঝামেলায় ফাঁসা।' এই কথা বলে ক্যালেক্টারির খাতাটা বন্ধ করে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। উপকার করতে যাচ্ছেন এই রকম একটা ভাব করে কলম দিয়ে কান খুঁটতে লাগলেন।

রেলের খালাসী মিনিটখানেক বসে কি যেন ভাবল। বৈদ্যজীকে মাথা হেঁট করে নিজের কাজে মশগুল দেখে আস্তে আস্তে দোকান থেকে নেমে পড়ল। বৈদ্যজী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ভাবলেন কথাটা খুব বেফাঁস বলা হয়ে গেছে। এর আর কোনও চাড়া নেই। কি যে করা উচিত তা বুঝতে না পেরে বৈদ্যজী ডাক দিলেন, 'আরে শুনে যা, ঠাকুর সোবরন সিংকে আমার নমস্কার দিস, ওর ছেলেপুলে সব ভাল তো?'

'হ্যাঁ, খবর সব ভালই', একটু থেমে গিয়ে খালাসী বলল।

খালাসির যাতে কানে যায় সেইজন্যে একটু উঁচু গলায় বৈদ্যজী চন্দরকে বলেন, 'দশ গাঁ ঠেঙিয়ে ঠাকুর সোবরন সিং আমার কাছে চিকিৎসা করাতে আসে। আর আমিও ওর জন্যে হামেহাল হাজির...' চন্দর বোর্ডের শেষ অক্ষরটা শেষ করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কি, চলে গেল?'

‘ঘুরে ফিরে আবার ঠিক আসবে...’ এই বলে বৈদ্যজী নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন আর মনে মনে ভাবেন বাছাধনকে ফিরতেই হবে। সাধে কি বলে, গাঁয়ে বৈদ্যও যা উকিলও তা। সোবরন সিং যদি ওর কাছে আমার নাম করে থাকে তবে ওকে আসতেই হবে... গাঁয়ের লোকের ট্যাঁক থেকে সহজে কিছু গলতে চায় না। একটু বসে ভেবেচিন্তে তারপর আসবে...।’

‘যদি আর কোথা থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় করে নেয়’, চন্দরের কথা শেষ না হতেই বৈদ্যজী বলে ওঠেন, ‘না, না তা হতে পারে না।’ বলে উঠেই সাইনবোর্ডে একবার চোখ বুলিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। ‘বাহবা, বেশ সুন্দর হয়েছে, এতেই বেশ কাজ চলে যাবে। এর জন্যে পাঁচ টাকা পেন্টারকে দিতে হলে, রুগীর ঘাড় ভাঙতে হত। ঐ এক্কাগাড়ি রাখার মতন। দুষ্টুই এক। ঘুরিয়ে নাক দেখানো আর কি। সৈয়দ আলীর আঁকা বোর্ড তো আর রুগীকে সারাবে না। এত বোঝবার কথা। বলে একটু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। নিজের কথাতেই নিজে হাসলেন কিনা বোঝা গেল না।

এই সময় আর একজন লোক দোকানে ঢুকল। মনে হল খালাসীটাই ফিরে এল। কিন্তু আসলে তা নয়, একটা ন্যাবা রুগী। বৈদ্যজী যে খুব খুশি হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল। ভেতরে গেলেন। একটা মাদুলী নিয়ে এসে রোগীকে বললেন, ‘এইবার এর খেল দেখ। কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে তোমার রোগ পালাতে পথ পাবে না।’ রোগীর হাতে মাদুলীটা বেঁধে দিয়ে পকেটে পয়সা পুরে বৈদ্যজী আবার গম্ভীর হয়ে বসে পড়লেন। রুগী চলে যাবার পরে বললেন, ‘এই বিদ্যেটা আমার বাবা খুব ভাল জানতেন। বাবার লেখা অনেক বই পড়েছি... অনেক সময় ভাবি যে তাঁর সব বিদ্যে আবার কাজে লাগাই...। অনেক বুঝেসুঝেই তিনি লিখে গেছেন। ...এ সব বিশ্বাসের কথা। এক কণা ধুলোতে লোক চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হোমিওপ্যাথিষ্টরা কি বল? একটা ছোট্ট চিনির গুলি ছাড়া তো কিছু নয়। একবার বিশ্বাস জন্মানো নিয়েই কথা।

চন্দর যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বলল, ‘দাওয়াইখানা বন্ধ করার তো সময় হয়ে এল, খেতে যাবেন না?’

‘তুমি এগোও, আমি দু’চার মিনিট পরে যাব’, বলেই বৈদ্যজী আবার সেই কালেক্টরির খাতাগুলো টেনে নিয়ে কাজে বসলেন। দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন। বাইরে রোদের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

পাশের দোকানদার বচ্চনলাল দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিল। বৈদ্যজীর দরজা হাট করে খোলা দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপার, আপনি এখনও খেতে গেলেন না?’

‘একটা জরুরি কাজ এসে পড়েছে। এই আর খানিকটা বাদেই যাব’, বলেই বৈদ্যজী একটা মাদুর পেতে কাগজ, রেজিস্ট্রার, কালি ইত্যাদি সব টেবিল থেকে নামিয়ে নিলেন। কিন্তু যা গরম, দর দর করে ঘাম গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে হাত পাকা দিয়ে ঘাম শুকিয়ে নিয়ে নকল করতে লাগলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুক্ষণ কাজ করলেন। কিন্তু একটু পরেই হাঁপিয়ে উঠলেন। লেখা ছেড়ে ধুলোপড়া শিশিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। শিশিগুলো পর পর সাজালেন। কিন্তু গ্রীষ্মের দুপুর যেন আর কাটতে চায় না। দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে একবার রাস্তার দিকে তাকালেন। পথে এক আধজনই নজরে পড়ল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন। ভেতরে গিয়ে সাইনবোর্ডের তারটা ঠিক করে বোর্ডটা বাইরে টাঙ্গালেন। ধন্বন্তরী ঔষধালয় বোর্ডটা মাদুলীর মতন দোকানের গলায় দুলতে লাগল।

আরও খানিকটা সময় কেটে যায়। শেষে বেশ এক ঘটি জল খেয়ে উরুর ওপর কাপড় তুলে তোড়জোড় করে আবার কাজে বসে গেলেন। বাইরে একটা আওয়াজ হতেই একটু চিন্তান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

‘আজ এখনও বাড়ি যাননি বৈদ্যজী?’ জানাশোনা একজন দোকানদার বাড়ি যাবার পথে বৈদ্যজীকে শুধালো।

‘যাব যাব করছিলাম, কিন্তু কিছু কাজ বাকি থাকায় ভাবলাম কাজটা সেরেই যাই...’ বলে বৈদ্যজী দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসলেন। গায়ের জামা খুলে একপাশে রেখে দিলেন। বৈদ্যজীর দোকানটা একতলা ঘরে। ঘরের ছাদ রোদে যেন পুড়ে ঝামা হয়ে যাচ্ছে। চোখে তাঁর ঘুম জড়িয়ে এসেছে। ঢুলতে ঢুলতে একটু ঘুমিয়েও নিলেন, খানিকটা সময়ও কেটে গেল। যখন আর বসে থাকতে পারলেন না তখন রেজিস্টারগুলোকে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ার পর কিন্তু ঘুম ছেড়ে গেল। কেবলই উসখুস করতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠেন। উঠে বসলেন। বচ্চনলাল সারা দুপুরটা বাড়িতে কাটিয়ে দোকানে ফিরেছে।

‘কি ব্যাপার, আপনি আজ এখনও এখানে, বাড়ি যাননি?... বচ্চন সিং জিজ্ঞেস করল।

বৈদ্যজী জোরে জোরে হাতপাখাটা নাড়াতে লাগলেন। বচ্চনলাল ওঁর দোকান থেকে নেমে যেতে যেতে বলল, ‘আপনি কি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন।’

হ্যাঁ একটা রুগী আসার কথা আছে এখনও পর্যন্ত এল...’ বচ্চনলালকে চলে যেতে দেখে বৈদ্যজীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, শেষ আর হল না, চুপ করে ঘাম মুছতে লাগলেন।

অনুবাদ **ইন্দ্রাণী সরকার**

লেখক পরিচিতি

কমলেশ্বরের জন্ম উত্তরপ্রদেশের মঈনপুরে, ১৯৩২ সালের ৬ জানুয়ারি। কিছুদিন এলাহাবাদে থাকার পর দিল্লিতে স্থায়ী হন। মুম্বইয়েও ছিলেন অনেকদিন। গল্পউপন্যাস দুইই লিখেছেন। গল্পের মধ্যে ‘রাজা নিরবংসিয়া’, ‘কসবে কা আদমি’, ‘খোঈ হুঈ দিশায়েঁ’, ‘মাস কা দরিয়া’ প্রভৃতি নামকরা। উপন্যাসের মধ্যে ‘এক সড়ক, সত্তাবন গলিয়াঁ’, ‘ডাক বঙ্গলা’ ও ‘তিসরা আদমি’ উলেস্নখযোগ্য। ‘কিতনে পাকিস্তান’ উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন ২০০৩ সালে। ২০০৫ সালে ভূষিত

এই সময় আর একজন লোক দোকানে ঢুকল। মনে হল খালাসীটাই ফিরে এল। কিন্তু আসলে তা নয়, একটা ন্যাবা রুগী। বৈদ্যজী যে খুব খুশি হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল। ভেতরে গেলেন। একটা মাদুলী নিয়ে এসে রোগীকে বললেন, ‘এইবার এর খেল দেখ। কুড়িপঁচিশ দিনের মধ্যে তোমার রোগ পালাতে পথ পাবে না।’ রোগীর হাতে মাদুলীটা বেঁধে দিয়ে পকেটে পয়সা পুরে বৈদ্যজী আবার গম্ভীর হয়ে বসে পড়লেন।

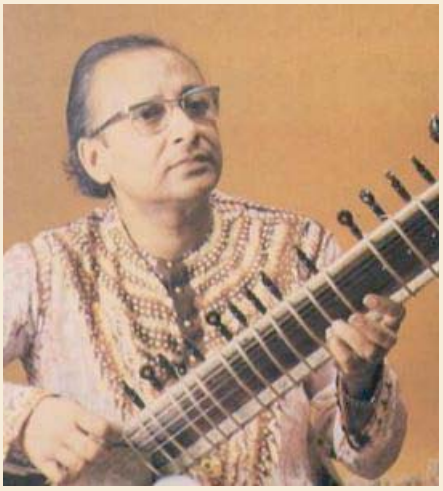

পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইহার ঘরানার প্রখ্যাত সেতারী পণ্ডিত নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায় এক সংগীতপ্রেমী পরিবারে, ১৯৩১ সালের ১৪ অক্টোবর। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছাত্র এই প্রখ্যাত ভারতীয় সেতারশিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন।

খুব বাল্যকাল থেকেই তাঁর সঙ্গীতে আগ্রহ ও বুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পিতা জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শখের সেতারী। মাত্র চার বছর বয়সে নাছোড়বান্দা নিখিলের তাগাদায় তাঁর পিতা তাঁকে একটি ছোট সেতার কিনে দেন এবং সেতার বাজানো শেখান। অতি অল্পকালেই তিনি শিশুপ্রতিভা হিসেবে পরিচিত হন এবং মাত্র ন'বছর বয়সে *নিখিল ভারত সেতারবাদন প্রতিযোগিতায়* শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর তর ণতম শিল্পী হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে ওস্তাদ মোশতাক আলী খাঁর কাছে নিয়ে যান, তবে তাঁর কাছে তিনি মাত্র ক'সপ্তাহ শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে অধুনা বাংলাদেশের গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর রায় তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সাল নাগাদ প্রবাদপ্রতিম গায়ক ওস্তাদ আমীর খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাঁর বোনের গান শেখার মাধ্যমে। ওস্তাদ আমীর খাঁর সঙ্গীত তাঁর সাঙ্গীতিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

১৯৪৭ সালে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নিখিল তাঁর অনুষ্ঠানে নিয়মিত হাজির হয়ে তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে থাকেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ অধিক ছাত্র নিতে নারাজ। শেষে নিখিলের সেতারবাদনের বেতারস ম্প্রচার শুনে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁকে শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হন। অতঃপর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁই নিখিলের প্রধান গুরু হয়ে ওঠেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর তালিমে নিয়মানুবর্তিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তাঁর কাছে নাড়া বাঁধার পর নিখিলকে ভোর চারটা থেকে মাঝে কিছু বিরতি দিয়ে রাত এগারটা পর্যন্ত তালিম নিতে হত। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে অন্যান্যদের মধ্যে সরোদে তাঁর পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পৌত্র আশিস খাঁ, ভাইপো ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও বসন্ত রায়; সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর; সুর বাহারে তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা ও বাঁশিতে পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষ তালিম নিতেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে তিনি শেখেন সেতারের বাজের সঙ্গে রুদ্রবীণা, সুরবাহার ও সুরশৃঙ্গারের নান্দনিক বীণবাজএর ল ম্বা আলাপ ও সূক্ষ্ম কাজের মিশ্রণ। এক প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর মত তিনি যেখানে যা ভাল শুনেছেন, তাই আহরণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিজের মতে, তাঁর ওপর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ এবং কিছু পরিমাণে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাঈ কেরকার ও রোশনারা বেগমের প্রভাব পড়েছিল। বহু সূত্র থেকে, এমনকি সঙ্গীতজগতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছেও, শোনা যায় যে, একসময় তিনি পণ্ডিত রাধিকামোহন মৈত্রের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর কোনও আত্মপরিচিতিতে এ তথ্যের উল্লেখ নেই।

মাইহার থেকে ফিরে নিখিল দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পুত্র ও কন্যা– ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে তালিম অব্যাহত রাখেন। তিনি ১৯৬৮ সালে *পদ্মশ্রী* এবং ১৯৭৪ সালে *সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারে* ভূষিত হন।

পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবৎকালে ভারতবর্ষে সেতার বাদনের দুই দিকপাল– পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ– মার্গ সঙ্গীতের আসর আলো করে ছিলেন। প্রথমজন ছিলেন মাইহার ঘরানারই ফসল। তিনি তন্ত্রকারী অঙ্গে সেতার বাজাতেন, যা যে কোন তারের যন্ত্র বাজাবার শৈলী। তবে পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর ছেলেবেলাকার নৃত্যশিক্ষা থেকে অর্জিত লয়কারী ও নৃত্যপরা ছন্দ এবং তাঁর অতি উচ্চকোটির ধ্যান ও ভাবনা দিয়ে তাঁর বাজনাকে এক অন্যস্তরে উন্নীত করেছিলেন। অন্যদিকে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ তাঁর বাজনায় অসাধারণ তৈয়ারির সঙ্গে যোগ করেছিলেন গায়কী অঙ্গ অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে খেয়াল গাওয়া হয়। তাঁর বাজনায় অসাধারণ মিষ্টতার সঙ্গে ছিল বিদ্যুতের গতি এবং যেখানে তন্ত্রকারী শৈলীর বাদকেরা গৎ বাজাতেন, তিনি সেখানে বাজাতেন খেয়ালের বন্দিশ যা তিনি বাজনার ফাঁকে ফাঁকে গেয়েও শোনাতেন। তখন যাঁরা গানবাজনা শুনতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রথমটির ভক্ত, কেউবা দ্বিতীয়টির। পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনায় এই দুই শৈলীর সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর বাজনা মানুষের মনকে মুগ্ধ করেনি, এমন ঘটনা বোধহয় কখনও ঘটেনি। বাজাবার সময় তিনি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, মনে হত তিনি যেন ধ্যানে বসেছেন। বস্তুতই বাজনা তাঁর কাছে ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা। এ বিষয়ে বিদেশে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন: 'ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি আধ্যাত্মিক; সেটিই প্রথম কথা, সেটি আপনাদের মনে রাখতে হবে। অনেকেই ভুল বোঝেন, ভাবেন, এর সঙ্গে বোধহয় ধর্মের যোগ আছে– তা একেবারেই না! এটি ধর্ম সাধনা নয়, আধ্যাত্মিকতার সাধনা– পরম সত্যকে জানার জন্য ভারতীয় সংগীত শিখতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। মীরাবাঈ, দক্ষিণ ভারতের ত্যাগরাজ, হরিদাস স্বামী, বৈজু– এই সব মহান সঙ্গীতসাধক সাধুসন্তের মত ঘুরে বেড়াতেন; তাঁরা কখনও লোকালয়ে আসতেন না, জনসমক্ষে গানও গাইতেন না।'

আশির দশকে তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। ১৯৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি মাত্র ৫৪ বছর বয়সে চতুর্থবারের হৃদরোগে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেদিন ছিল তাঁর কনিষ্ঠাকন্যার জন্মদিন। ভারত সরকার মরণোত্তর *পদ্মভূষণ* উপাধি দিয়ে এই কৃতি সঙ্গীতগুণীকে সম্মান জানিয়েছেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩, ২৪ ও ৩১ আগস্ট ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত পরিবেশনরত দোলন কানুনগো, চন্দনা মজুমদার ও রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

৭, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কণ্ঠসংগীত পরিবেশনরত ছন্দা চক্রবর্তী, মিতা হক ও নাসিমা শাহিন ফেন্সি

১৪, ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কণ্ঠসংগীত পরিবেশনরত তপন মাহমুদ, ভারতের গৌরী গুহ ও প্রমোদ দত্ত

২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর এবং ৪ অক্টোবর ২০১৩ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত পরিবেশনরত অনুপ বড়ুয়া, ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম ও ড. চঞ্চল খান

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra October 2013

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

†níjvBbmg~n: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উল্লেখ করতে হবে–
  1. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  2. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  3. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  4. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত